লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ২৩ ও ২৪তম সংখ্যা

১৬ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ২৫ জমাঃ সানি, ১৪২৯ হিজরি

৩০ ইহসান, ১৩৮৭ হিঃ শাঃ ■ ৩০ জুন, ২০০৮ ঈসাব্দ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

MUSLIMS NEED TO UNDERSTAND TRUE MEANING OF JIHAD

-HEAD OF AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

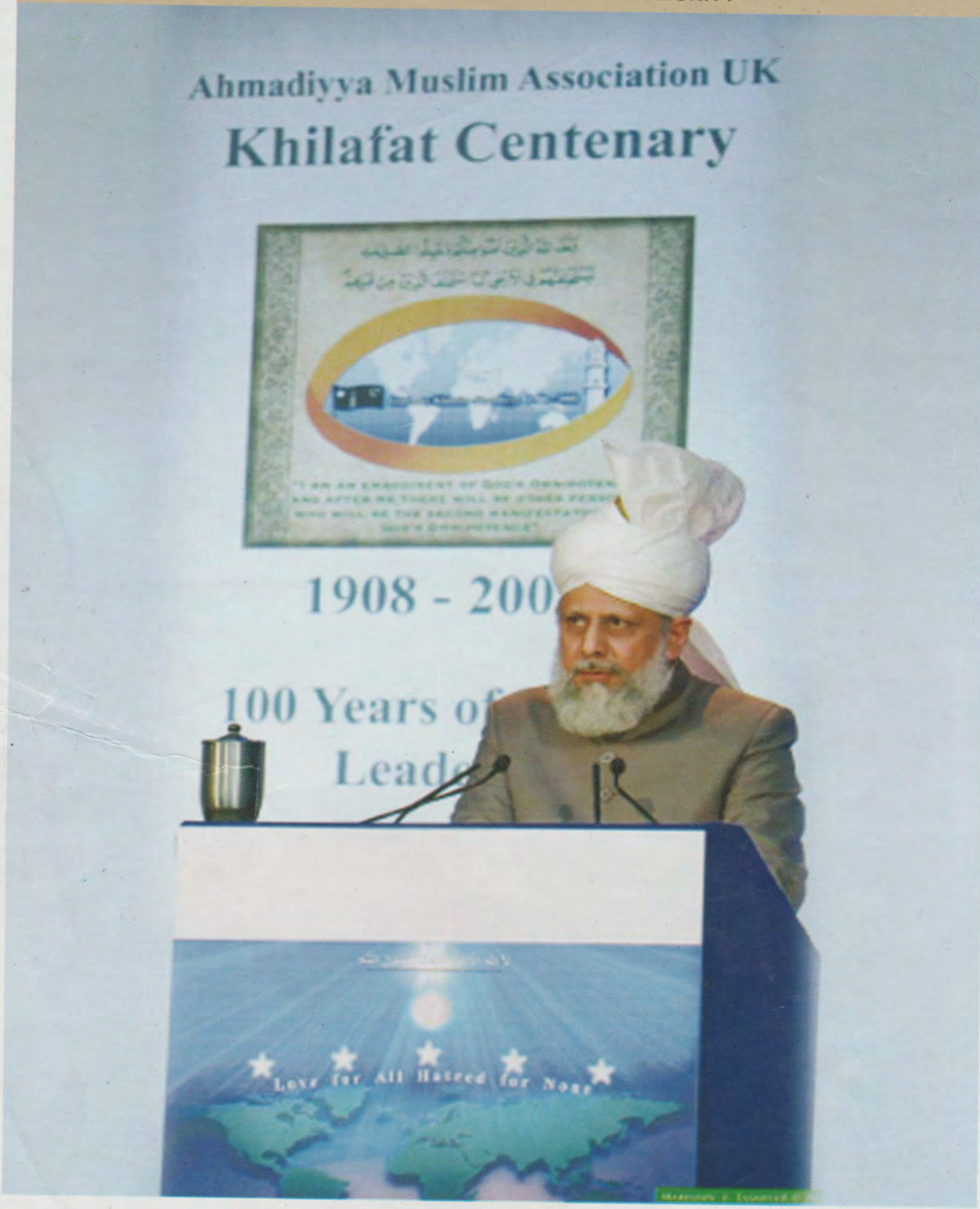

Ahmadiyya Centenary celebrations attended by
Ministries, Members of Parliament and Many other dignitaries

[বিস্তারিত রিপোর্ট: ৪০ পৃষ্ঠায়]

সম্পাদকীয়

মুবারক হোক

নিষ্ফলা এক দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর আল্লাহ্ তাআলা অপার অনুগ্রহে কাদিয়ানের পুণ্যভূমি থেকে ধর্ম জগতের ফলদায়ী এক সজীব বৃক্ষের উদ্ভব ঘটালেন। যার ফল প্রকাশিত হলো ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ। স্বল্পবুদ্ধি ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নরা তা দেখতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোতির্ময় ঐ আলো নব নব আলোকচ্ছটায় দুই দশকের অধিককাল জুড়ে জগতকে আলোকিত করে ২৭ মে ১৯০৮ স্থায়ী জীবনের পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে উর্ধ্বাকাশে উত্থিত হয়েছেন। এ জন্য আকাশে লিখে দেয়া হয়েছে যে তার মূর্তিমান বিকাশ ঘটতেই থাকবে। চেহারা আদলে পরিবর্তন থাকবে বটে কিন্তু অন্তরাত্মার গভীর প্রদেশ থেকে নির্গত ধ্বনির যে বাণী, তা থাকবে অপরিবর্তিত-একই।

এ প্রেক্ষাপটে বিগত হাজার বছরের ধর্ম ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্য দিন হলো ২৩ মার্চ ও ২৭ মে।

আমরা কত ভাগ্যবান যে আমরা ঐতিহাসিক ২৩ মার্চ-এর শতাব্দীকাল পুরো হতে দেখেছি আর এখন সেই মহিমা মন্ডিত ২৭ মে দিনটিরও শতাব্দীকাল পূর্ণ হওয়া দর্শন করলাম।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হাজার হাজার সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের পর খিলাফতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে এটি এক ব্যতিক্রমই কৃপা যা এই খিলাফতের সিলসিলায় এক শতাব্দীকালের মধ্যেই বিশ্ব জনীন রূপ লাভ করেছে আর সেই খিলাফত এখন শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপন করছে।

আসুন! মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে আমরা হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি।

অতএব মুবারক হোক তাদের সবার–

* যারা হাজার বছর ধরে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম (আ.)-এর জন্য অপেক্ষারত ছিলেন

* যারা যুগ ইমামের প্রতি ঈমান এনে তাঁকে 'সালাম' পৌছিয়েছেন আর এরই কল্যাণে হিংস্র থেকে হিংস্রতর জন্তু জানোয়ারের কবল থেকে আত্মরক্ষা করেছেন

* যারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর তাঁর খিলাফতের প্রতি ঈমান এনে আমলে সালেহ সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন

৩০ জুন ২০০৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	৩
● হাদীস শরীফ	৪
● অমৃত বাণী	৫
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৭-১৩
● নেযামে নও (নব বিশ্ব ব্যবস্থা) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	১৪-১৭
● মাহিল্লার আসীরানে রাহে মাওলার ঈমানবর্ধক বৃত্তান্ত মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	১৮-২৮
● কীর্তিমানের জীবন কথা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৯-৩২
● সোজা পথ উল্টো জগত মৌলবী হাফেয মোহাম্মদ সেকান্দর আলী	৩৩-৩৬
● বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত কিছু কথা আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম	৩৭-৩৯
● প্রেস রিলিজ ঃ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ডেস্ক থেকে	৪০-৪৩
● সংবাদ ঃ	৪৪-৫০

প্রচ্ছদঃ প্রথম প্রচ্ছদ মসজিদ বায়তুজ্ জামে', সিকাগো, ইউএসএ, শেষ প্রচ্ছদ আহমদীয়া পার্ক, ম্যাপ্‌ল অন্টারিও, ক্যানাডা

* যাঁদেরকে খোদা তাআলা খিলাফতের মুকুট পড়িয়েছেন আর জগতে নিজের প্রতিনিধিত্ব দান করে সম্মানিত করেছেন

* যাদের ধর্মকে আল্লাহ্ তাআলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আর ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলিয়ে দিয়েছেন।

* যারা আনুগত্যের উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করে জগতে শিসা ঢালা প্রাচীরের দৃশ্য প্রদর্শনকারী এক উম্মতে পরিণত হয়ে গিয়েছেন

মুবারক হোক –

অনেক অনেক মুবারক তাদের সবাইকে

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ এতে ১০ রুকু এবং ১২৪ আয়াত আছে

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। 'আনাল্লাহু আরা' অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি। (এটি) এমন এক কিতাব যার আয়াতগুলো [১২৯৩] সুরক্ষিত[১২৯৩-ক] (ও) ত্রুটিহীন করা হয়েছে। এরপর এগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে[১২৯৪]। এ হলো পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

৩। (এগুলোতে বলা হয়েছে,) তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তাঁর কাছ থেকে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ③

৪। এবং (আরো বলা হয়েছে), তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইবে (এবং) এরপর তাঁর কাছে তওবা করবে[১২৯৫]। তাহলে তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার (যথাযথ) মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিষয়ে এক ভয়ঙ্কর দিবসের আশঙ্কা করছি।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④

১২৯৩। আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টীকা ১৬)।

১২৯৩-ক। 'আহকামাহু' অর্থ তিনি এটিকে শক্ত করলেন, দৃঢ় করলেন, মজবুত করলেন এবং ত্রুটিবিহীন করলেন বা অপূর্ণতামুক্ত করলেন 'আহকামাতহু' আত্তাজারিবু'-অর্থ পরীক্ষা-নীরিক্ষার অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞানী বিচার শক্তিতে পরিপক্কতা দান করলো (লেইন)।

১২৯৪। এখানে 'ফুসসিলাত' শব্দটি 'মুতাশাবেহাত' (৩:৮ এ ব্যবহৃত) শব্দের স্থলাভিষিক্ত, যার মাধ্যমে কুরআন করীমের শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এমন প্রশ্নাতীত যে, এর বিকল্প অসম্ভব। কিন্তু ইসলামের সম্পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে, এর মৌলিক শিক্ষা এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার উভয়বিধ শিক্ষাই জানা প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে, ব্যাখ্যা মৌলিক বিষয়ের ব্যতিক্রম হবে না, সমর্থনকারী হতে হবে।

১২৯৫। এ আয়াতে দেখা যায় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে তওবার স্থান ইস্তেগফারের পরে এবং উচ্চ পর্যায়ের। পূর্বে-কৃত পাপসমূহের কুফল থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার নাম 'তওবা'। আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য তা থেকে উৎকৃষ্টতর পন্থা চিন্তা করা যায় কি?

হাদীস শরীফ

আনুগত্য

কুরআন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী। অতঃপর যতি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি সমর্পণ করো যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপরে ঈমান রাখো। এটা বড়ই কল্যাণজনক ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম" (সূরাতুন নিসা ঃ ৬০ আয়াত)।

হাদীস ঃ

ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, **"প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার কর্মকর্তার আদেশ পালন করা আবশ্যকীয় যদিও বা তার (কর্মকর্তার) আদেশ ভালো লাগুক বা না লাগুক, তবে হ্যাঁ, যদি গুণাহ্ বা নাফরমানীর (খোদা ও রসূল সা.-এর হুকুম বিরোধী) আদেশ থাকে তবে তা পালন করা আবশ্যকীয় নয়"** (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের এক সুসভ্য ও সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে পরিণত হবার মূলমন্ত্র বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে, হে মুসলমানগণ! আনুগত্য করো, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত।

উপরোক্ত হাদীস ইসলামী আনুগত্যের এক স্বর্ণালী শিক্ষার নীতি বর্ণনা করছে। ইসলাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ধর্ম। ইসলাম কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণের শিক্ষা দেয় না। তবে যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাকে আনুগত্য ও সুশৃঙ্খল হবার আদেশ দেয় ও তাকে বলে তোমার জীবন এখন এক বিধি-বিধানের মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে এবং এটাই ইসলামের ঐকান্তিক দাবী। ইসলামের শিক্ষা হলো শুনো ও মানো। এ শিক্ষা দেয় না যে, যা ভালো লাগে তা মানো আর যা ভালো লাগে না তা মান্য করো না। হ্যাঁ, যদি কোন কর্মকর্তা শরীয়ত বিরোধী আদেশ দেয় তবে তা মান্য করা আবশ্যক নয়। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। যখন আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন নিজের ইচ্ছা অথবা কোন শর্ত থাকে না। তাই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশকারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের উপর কর্মকর্তার নির্দেশ শুনা ও মান্য করা আবশ্যকীয়। এর মধ্যেই তোমরা শান্তি খুঁজে পাবে ও উন্নতি লাভ করবে। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় হলো সমস্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে মান্য করা হোক। আজ ইসলামী বিশ্বে যে হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা তার মূল কারণ হলো যোগ্য নেতার অভাব ও যারা তথাকথিত নেতা হিসেবে আছেন তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে খোদা ও রসূলের নাফরমানী।

বিশ্বে আজ কেবল একটি জামাআত আছে যার নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাআত। এর সদস্যগণ এক নেতার অধীনে উঠে বসে। পৃথিবীর প্রায় ১৯০ টি দেশের আহমদীদের কান খাড়া থাকে খিলাফতের ডাকে। তাঁর কাছ থেকে যে আদেশ আসে তা পালন করতে তারা ব্রতী হয়ে আছে। খিলাফতে আহমদীয়ার কেয়ামতকাল অবধি টিকে থাকা নির্ভর করে আমাদের ঐকান্তিক আনুগত্যের উপর। খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি অগাধ আনুগত্যের ফলেই আজ আহমদীরা খিলাফতের শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফিক দিন। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ) কে গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছোনা? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে কি জাগতিক ধন-সম্পদের বিনিময়ে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ তাআলার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীষ্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখেনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধিতা করে হীন-পতিত বস্তু সুদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লার কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্য পশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমির কিছুই অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্চে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে খ্রীষ্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং আমাকে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে মীমাংসাকারী ও সুবিচারক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদ (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রীষ্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'। (সিররুল খিলাফা, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

"কুরআন শরীফের অর্থ করার সময় সর্বদা এ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রেখো এর কোন অর্থ যেন ঐশী গুণাবলীর পরিপন্থী না হয়।"

যে অর্থই কর, দৃষ্টি রাখ কোথাও তা খোদার 'কুদ্দুস' বৈশিষ্ট্যের বিরোধী নয় তো!

"খোদা কুদ্দুস কিন্তু মানুষ 'কুদ্দুস' আখ্যায়িত হতে পারে না কেননা, খোদাতা'লা আপন সত্ত্বায় নিষ্কলঙ্ক আর মানুষ সাধনা করে কালিমা মুক্ত হয়।"

"এটিই ছিল মহানবী (সা:)-এর পবিত্রকরণ শক্তি যা মাটি থেকে তুলে নিয়ে সাহাবীদেরকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। নিজেদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রমাণ করুন যে, আপনারা কুদ্দুস খোদার বান্দা; পবিত্র গ্রন্থের মান্যকারী, পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর অনুসারী ও তাঁর খলীফা এবং বিশেষভাবে এই মহান মুজাদ্দিদ অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর অনুসারীরা এমনই।"

স্মরণ রেখো! খোদা কুদ্দুস, তাই কেবল পবিত্ররাই তাঁর নৈকট্য লাভ করবে।

"আল্লাহ্তা'লার কুদ্দুস বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন অর্থ আছে; আর এ বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণমন্ডিত হবার প্রেক্ষাপটে জামাতের সদস্যদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা।"

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ] (آمين)

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজীদে প্রদত্ত ২০শে এপ্রিল, ২০০৭ এর (২০শে শাহাদত, ১৩৮৬ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

আল্লাহ্তা'লার এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কুদ্দুস। বিভিন্ন অভিধানে এ শব্দের যে অর্থ লিখিত রয়েছে এবং অভিজ্ঞ মুফাস্সেরগণ যে তফসীর করেছেন তা থেকে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তফসীরকারকের সংক্ষিপ্ত তফসীর ও অর্থ আমি উপস্থাপন করছি।

তাজুল উরূসে লিখিত আছে, 'আল্ কুদ্দুস' আল্লাহ্তা'লার অনুপম নামগুলোর একটি আর 'আল কুদ্দুস' এর অর্থ হচ্ছে 'আত্ত্বাহের' অর্থাৎ সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত এক সত্ত্বা, 'আল্ মুবারক' অর্থাৎ কল্যাণময়, যার সত্ত্বায় সকল প্রকার কল্যাণ পুঞ্জীভূত এবং 'আত্ তাক্বদিস' এর মর্মার্থ হচ্ছে, 'আত্তাত্বহির' মহাসম্মানিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্কে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক সাব্যস্ত করা।

মুফরাদাতে ইমাম রাগেব লিখেছেন, 'আত্ তাক্বদিস' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সেই পবিত্রতা, সেই শুচি বা শুদ্ধতা যা খোদাতা'লার বাণী ওয়া ইউত্বাহ্হিরুকুম তাত্বহীরা-তে উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বাহ্যিক নোংরামি দূর করা নয় বরং ভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, মানবীয় প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধন হলো এর উদ্দেশ্য।

আকরাবুল মাওয়ারেদে লিখিত আছে, কুদ্দুস এমন সত্ত্বা যিনি পবিত্র এবং যাবতীয় কালিমা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র; সম্পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র অর্থাৎ সবদিক থেকেই যাকে পবিত্র করা

হয়েছে। এরপর 'আল কুদ্স' এর অর্থ লিখেছেন, পবিত্রতা ও কল্যাণ। লিসানুল আরবে প্রায় এরূপ অর্থই করা হয়েছে। এ হলো কয়েকটি প্রসিদ্ধ আরবী অভিধানে কৃত অর্থ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এসব অভিধান থেকে যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হলো, 'আল কুদ্দুস' যাবতীয় পবিত্রতার সমাহার অর্থাৎ কেবল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তই নয় বরং সব ধরনের প্রশংসাসূচক গুণাবলীও নিজের মাঝে ধারণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা সেই পবিত্র সত্ত্বা যাঁর মাঝে সর্বপ্রকার পবিত্রতার সমাহার ঘটেছে। সব ধরনের কালিমা থেকে তিনি মুক্ত। আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বায় কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকার প্রশ্নই উঠে না আর মানুষ কল্পনা করতে পারে এমন কোন গুণ নেই যা তাঁর মাঝে বিদ্যমান নেই। এক কথায় মানব চিন্তাশক্তি যে সকল গুণাবলীকে আয়ত্ব করতে পারে এবং সে সকল গুণাবলী যা মানবিক চিন্তাশক্তির বাহিরে সবই তাঁর মাঝে পুঞ্জিভূত রয়েছে; এটিই সেই পবিত্র সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্ব।

এখন এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকজন তফসীরকারকের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরিশতারা আল্লাহ্‌তা'লাকে বলেন, نقدس لك (নুক্বাদ্দিসু লাকা)। তফসীর 'মাজমাউল বায়ানে نقدس لك (নুক্বাদ্দিসু লাকা)-র অর্থ করা হয়েছে, হে আল্লাহ্! ত্রুটিযুক্ত সেই সব বৈশিষ্ট্য যা তোমার মর্যাদার পরিপন্থী আমরা তোমাকে এমন সব বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করছি আর ত্রুটিযুক্ত কোন বিষয়ই তোমার প্রতি আরোপ করি না।

এ অর্থের আলোকে نقدس لك (নুক্বাদ্দিসু লাকা)-'য় বাড়তি 'লাম' বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই লামের অনুবাদও অন্তর্ভূক্ত করে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমরা তোমার জন্য নামায পড়ি আবার কেউ অর্থ করেছেন, হে আল্লাহ্! আমরা আমাদের কামনা-বাসনাকে তোমার জন্য অর্থাৎ তোমারই সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে এ প্রসঙ্গে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী লিখেন,

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

(ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুক্বাদ্দিসু লাকা) সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি এ সন্দেহের অবতারণা করেছেন যে, ফিরিশতারা আদম সৃষ্টির সময়

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

বলে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে আপত্তি উত্থাপন করেছিল। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী এ সন্দেহের অপনোদন করে লিখেন, দু'টি কারণে এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ ফিরিশতারা 'সৃষ্টির' প্রতি খুন-খারাবী আর বিশৃঙ্খলা আরোপ করেছে, স্রষ্টার প্রতি নয়। দ্বিতীয়তঃ ফিরিশতারা তাদের এ কথার অব্যবহিত পরেই বলেছে,

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

(ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুক্বাদ্দিসু লাকা) আর 'তসবীহ্'র অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বাকে সকল জড় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ঘোষণা করা, পবিত্র সাব্যস্ত করা আর তাক্বদিস এর মর্মার্থ হলো আল্লাহ্‌তা'লার কর্মকান্ডকে নিন্দনীয় ও অজ্ঞতাজনিত বৈশিষ্ট্যের উর্দ্ধে রাখা।

অনুরূপভাবে আল্লামা রাযী কুদ্দুস বৈশিষ্ট্যের অর্থ করেন, 'আল্‌কুদ্দুস' ও 'আল্‌কাদ্দুস' ('ক্বাফ' বর্ণের উপর পেশ এবং যবর উভয়টি ব্যবহৃত হয়েছে) শব্দ আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বা এবং বৈশিষ্ট্য, কাজ ও নির্দেশাবলী এবং নামসমূহের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনায় বড়ই ভাবসমৃদ্ধ। এতে যথেষ্ট বাগ্মীতা রয়েছে আর এটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। আল্লাহ্‌তা'লার সত্ত্বা অতীব নিষ্কলুষ যা অভিধান থেকেও প্রতিভাত। তাঁর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী যদি পরখ করতে চাও তাহলে 'কুদ্দুস' গুণের কথা স্মরণ রাখা উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এক স্থানে বলেছেন, পবিত্র কুরআনের সঠিক অর্থ যদি করতে হয় তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই দৃষ্টিগোচর রেখো। এক্ষেত্রে নিগুঢ়তত্ত্ব হলো; আল্লাহ্‌তা'লার 'কুদ্দুসিয়্যাত' বৈশিষ্ট্যের উপর যেন কোন আঁচ না লাগে। পবিত্র কুরআনের যে কোন ব্যাখ্যাই কর না কেন সর্বদা 'কুদ্দুসিয়্যাত' বৈশিষ্ট্যকে দৃষ্টিতে রেখো। অর্থাৎ সব দৃষ্টিকোনেই খোদাতা'লার সত্ত্বা নিষ্কলঙ্ক। এমন কোন ব্যাখ্যা বা তফসীর যেন না করা হয় যদ্দারা আল্লাহ্‌তা'লা যে ত্রুটিমুক্ত সে সত্যের উপর কোন আঁচ আসতে পারে। তাঁর প্রতিটি কর্ম ও নির্দেশ এ বৈশিষ্ট্যেরই নিরিখে কলঙ্কমুক্ত ও পবিত্র। তফসীর রুহুল বায়ানে

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতের একটি হলো, তোমার ইবাদতের তৌফিক লাভ করা। তাই আমরা তোমার প্রশংসা করে সেসব বিষয় যা তোমার মর্যাদার পরিপন্থী তা থেকে তোমাকে পবিত্র ঘোষণা করি। এই দিক দিয়ে তসবীহ্ 'জালাল' মহিমা ও প্রতাপ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক আর হাম্‌দ 'ইন'আম' বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত। نقدس لك 'র অর্থ লিখেন, মাহাত্ম্য ও সম্মানের যে অর্থই তোমার মর্যাদা সম্মত, তা আমরা তোমার মহিমাস্বরূপ বর্ণনা করছি আর যা তোমার মর্যাদার পরিপন্থী তা থেকে তোমাকে পবিত্র ঘোষণা করছি।

তফসীর ইবনে কাসীরে

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 'র

আলোচনা প্রসঙ্গে কাতাদহ্ বলেন, এখানে তসবীহ্'র অর্থ হলো প্রচলিত তসবীহ্ আর তাক্বদীস এর অর্থ সালাত বা নামায। অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীরাও এর অর্থ করেছেন, 'নুসাল্লি লাকা' অর্থাৎ হে খোদা! আমরা তোমার জন্য নামায পড়ি।

মুজাহিদ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 'র অর্থ করেছেন, 'নুয়াজ্জিমুকা ওয়া নুকাব্বিরুকা' অর্থাৎ, আমরা তোমার মহিমাকীর্তণ করি আর তোমার গরিমা বর্ণনা করি।

একইভাবে মুহাম্মদ বিন ইসহাকও অর্থ করেছেন, হে আল্লাহ্! আমরা না তোমার অবাধ্যতা করি আর না এমন কোন কাজে লিপ্ত হই যা তোমার অপছন্দনীয়। এরপর 'তক্বদীস' এর অর্থ 'আত্তাযীম' ওয়াত্তাত্হীর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করা, মাহত্ব এবং সব প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার স্বীকারোক্তিমূলক ঘোষণা দেয়া, এখেকেই 'সবুহ্' এবং 'কুদ্দুস' উদ্ভূত। 'সবুহ্'র অর্থ আল্লাহ্তা'লাকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত জ্ঞান করা আর 'কুদ্দুস' এর অর্থ এ ঘোষণা করা যে, সকল প্রকার পবিত্রতা এবং সম্মান তাঁকেই শোভা পায়। এরপর তিনি আরও লিখেন, এ সকল আলোচনার আলোকে وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ 'র অর্থ দাঁড়াবে; হে আল্লাহ্! মুশরেকদের আরোপিত সকল প্রকার ভ্রান্ত অপবাদ থেকে আমরা তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করছি। এবং

نُقَدِّسُ لَكَ -র অর্থ হে আল্লাহ্! অস্বীকারকারীদের বর্ণিত কদর্য অপবাদ ও আজে বাজে কথাবার্তা থেকে মুক্ত হওয়ার যে অনুপম বৈশিষ্ট্য তোমার মাঝে বিদ্যমান, আমরা তোমাকে সেসব বৈশিষ্ট্যের আধার হিসেবেই জানি।

আমি একটু আগে 'কুদ্দুস' শব্দ সম্বন্ধে একজন তফসীরকারকের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ করেছিলাম। পুরো উদ্ধৃতিটি এরূপ, তিনি (রাঃ) বলেন, **'এটি সত্য কথা যে, আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই খোদাতা'লার পবিত্রতার গান গায়। প্রতিটি অনু সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তিনি স্রষ্টা এবং তাঁরই প্রতিপালন, জীবনদান এবং স্থায়ীত্ব প্রদানের উপর সব কিছুর অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্ব নির্ভর করে।'** অর্থাৎ, প্রত্যেকের জীবনকাল রয়েছে আর তা স্থিতিশীল। **'তাঁরই প্রদত্ত সুরক্ষায় সবকিছু নিরাপদ। এরপর তিনি 'আল্লাহুল মালিক'ও বটে অর্থাৎ তিনি সর্বাধিপতি। শাস্তি যদি দেন তাও রাজাধিরাজের মত, যদি ধৃতও করেন তবে অত্যাচারীর মত নয় বরং রাজাধিরাজরূপেই, যেন ধৃত ব্যক্তির সংশোধন হয়।'** অর্থাৎ, যাকে ধৃত করা হয় তাকে সংশোধনের জন্যই তিনি ধৃত করেন। **'তিনি কেমন? তিনি 'আল্‌কুদ্দুস'। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে এমন কিছু নেই যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। বরং তিনি পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী আর সর্ব প্রকার দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত অর্থাৎ 'আল্‌কুদ্দুস'। হয় পবিত্র কুরআনের প্রতি মনযোগ না দেবার কারণে অথবা আল্লাহ্তা'লার নামের তাৎপর্য না বুঝার কারণেই মূলতঃ এক ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে যে, কখনও কখনও আল্লাহ্তা'লার কোন সুন্নত বা গুণবাচক নামের এরূপ অর্থ করা হয়ে থাকে যা তাঁর অপর বৈশিষ্ট্যের সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে এক উপায় বাতলিয়ে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের অর্থ করার ক্ষেত্রে সর্বদা এ বিষয়ে দৃষ্টি রেখো যে, কখনও এমন কোন অর্থ যেন করা না হয় যা ঐশী গুণাবলীর পরিপন্থী। আল্লাহ্তা'লার পবিত্র নামসমূহ্ দৃষ্টিপটে রাখো আর এমন যে কোন অর্থ করার ক্ষেত্রে দেখো যে, 'কুদ্দুসিয়্যাত' এ কোন আঁচড় লাগছে না-তো? অভিধান অনুযায়ী একটি শব্দের বহু অর্থ হতে পারে। আর নোংরা চিন্তাধারার এক ব্যক্তি ঐশী বাণীর কদর্য অর্থও প্রস্তাব করতে পারে**

আর ঐশী পুস্তকের বিরুদ্ধে আপত্তিও করে বসে। তোমরা সর্বদা একথা স্মরণ রেখো, অর্থ যা-ই করো তাতে পরখ করে নাও যে খোদার 'কুদ্দুসিয়্যাত' বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী হয়নি তো? আল্লাহ্‌তা'লার সমস্ত বাণী, সত্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যদ্দারা তাঁর এবং তাঁর রসূল ও সাধারণ মু'মিনদের সম্মান ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।' (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত-হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খন্ড-৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) জামাতকে যে উপদেশ দিয়েছেন এখানে আমি তাও উল্লেখ করছি। 'অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ এ নসীহত যা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা দরিদ্র অথবা পুরুষ বা নারী প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে গেঁথে নেয়া উচিৎ কেননা আত্ম সংশোধনের জন্য তা অত্যন্ত আবশ্যক আর এর ফলে ইবাদতের প্রতিও ঝোঁক সৃষ্টি হবে এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তিনি (রাঃ) বলেন, যারা অক্ষর জ্ঞানহীন নিদেনপক্ষে তাদের এমন হওয়া উচিত যে, তারা যেন নিজেদের আচার-আচরণ দ্বারা খোদাতা'লার নিষ্কলুষ হওয়ার স্বাক্ষর রাখে অর্থাৎ, নিজেদের কর্মকান্ড দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, কুদ্দুস খোদার বান্দা, পবিত্র গ্রন্থের মান্যকারী, পবিত্র রসূলের (সাঃ) অনুসারী ও তাঁর খলীফাগণ এবং বিশেষভাবে এই মহান মুজাদ্দিদ [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)] এর অনুসারী এমনই পবিত্র হয়ে থাকে। (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত-হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খন্ড-৩৭২-৩৭৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর অনুসারীরা যেন এমনই হয়, তাই নিজেদের মাঝে এরূপ পবিত্র পরিবর্তনই সৃষ্টি করুন। খোদাতা'লাকে সকল দোষ-ত্রুটি, নোংরামি থেকে পবিত্র জ্ঞান করা তখনই বস্তুনিষ্ঠ হবে যদি আমরা আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলি। তিনি (আঃ) বলেন, এরজন্য অনেক বেশি ডিগ্রীধারী শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলী কি; তা একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর আহমদীও জানে, বিভিন্ন খুতবা, বক্তৃতা এবং দরসে তারা শুনে থাকেন, কি-কি করার নির্দেশ রয়েছে আর কী করতে বারণ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) আমাদের জন্য কী আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। একজন আহমদী কর্তৃক খোদাতা'লার 'কুদ্দুসিয়্যাত' বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ পাবে তখনই যখন সে নিজের মধ্যে পূত পরিবর্তন আনবে এবং পবিত্র হবে, আর তা'হলেই এ যুগের ইমামকে মান্য করা সার্থক হবে।

তিনি (রাঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'স্মরণ রেখো! খোদা কুদ্দুস তাই পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।' সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য পবিত্র হওয়া আবশ্যক আর নৈকট্য লাভের জন্য দোয়া গৃহীত হওয়ারও প্রয়োজন। তাঁর সমীপে সমর্পনের আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু এর পূর্বে স্বয়ং নিজেকে পবিত্র করারও চেষ্টা করে যেতে হবে।

এ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, 'মানুষকে পুণ্য অর্জন করতে হয়' অর্থাৎ, সৎ কর্ম করলে এর প্রতিদান লাভ হয় অথবা তার মধ্যে সে গুণ সৃষ্টি হয়। আর খোদার পুণ্য বা খোদাতা'লার সদগুণাবলী তাঁর আপন সত্ত্বার অংশ; তাই খোদাকে কুদ্দুস বলা হয়। মানুষকে কুদ্দুস বলা যেতে পারে না; কেননা তিনি অর্থাৎ খোদাতা'লার নিজ সত্ত্বা নিষ্কলুষ 'আর মানুষ -চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে পরিশুদ্ধ হয়। নিষ্কলুষ হওয়ার এ বৈশিষ্ট্য তখন লাভ করবে যখন সাধনা করে ত্রুটিমুক্ত হবে। খোদাতা'লার সত্ত্বায় এমন কোন যুগ কাটেনি যখন তিনি অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত ছিলেন আর পরিপূর্ণ হবার চেষ্টা করেছেন! কিন্তু অপরদিকে মানুষ প্রথমে অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্তই থাকে তারপর ধীরে ধীরে উৎকর্ষতা লাভ করে। প্রথমে সে শিশু থাকে এরপর জ্ঞান বুদ্ধি হলে নামায পড়া আরম্ভ করে। এরপর একদিনের নামায তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়, দ্বিতীয় দিনের নামায তাকে আরো কিছুটা অগ্রগামী করে তৃতীয় দিনের নামায তাকে আরো আগে বাড়িয়ে দেয়।' এভাবে সে এগিয়ে যেতে থাকে। 'কিন্তু খোদাতা'লা আজ থেকে কোটি কোটি বছর পূর্বে যেরূপ ছিলেন আজও তদ্রূপই আছেন। তাঁর 'কুদ্দুসিয়্যাত' (পবিত্রতা) পূর্বেও কম ছিল না আর আজও বেড়ে যায়নি।' (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত তফসীরে কবির, ৫ম খন্ড-২০৭ পৃষ্ঠা)

তাঁর 'কুদ্দুসিয়্যাত' এবং সকল বৈশিষ্ট্যই

অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ্‌তা'লার 'কুদ্দুসিয়্যাত' বৈশিষ্ট্য থেকে মু'মিন তখনই সত্যিকার অর্থে লাভবান হতে পারে যখন সেই 'কুদ্দুস' খোদা প্রদত্ত শিক্ষানুযায়ী একজন মু'মিন স্বীয় ইবাদত ও নেকীতে উন্নতি করে।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, খোদাতা'লা'কে উদ্দেশ্য করে ফিরিশ্‌তাদের এ কথা বলা

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

অর্থাৎ, আমরা তোমার প্রশংসাসহ মহিমা কীর্তণকারী এবং তোমার মাঝে সকল প্রকার গরিমা রয়েছে বলে স্বীকার করি, তাসত্ত্বেও আদম সৃষ্টির প্রয়োজন কী ছিল? এর ব্যাখ্যায় তিনি (রাঃ) বলেন, 'ফিরিশ্‌তাদের একথায় আল্লাহ্‌তা'লা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' অর্থাৎ তোমরা যেভাবে বলছ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে আমিও জানি তা ঠিক কিন্তু একটি বিষয় তোমাদের অজানা যে, এখন মানবীয় কাজ কর্ম শরিয়তের মাপকাঠিতে যাচাই হবে আর যারা শরিয়তের শিক্ষাধীন থাকবে এবং সেই মোতাবেক কাজ করবে এবং 'কুদ্দুসিয়্যাত' এর বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ লাভের জন্য পুণ্য কর্মে অগ্রগামী হবে, তারা পরিশেষে ফিরিশ্‌তাদেরও ছাড়িয়ে যাবে। এ বিষয়টি ফিরিশতাদের জানা ছিল না।

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) লিখেছেন, 'এখানে সূক্ষ্ম একটি বিষয় স্মরণ যোগ্য আর তা হলো, আদমকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় খোদাতা'লা যা কিছু বলেছিলেন তা সঠিক আর ফিরিশতারা যা বলেছিলেন তাও সঠিক ছিল যেভাবে পূর্বেই বলেছি। 'এ কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। যে সব পুণ্যাত্মারা আদমের বংশধরে জন্ম নিতে যাচ্ছিলেন আল্লাহতা'লার দৃষ্টি ছিল তাদের প্রতি এবং সেই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় সৌন্দর্যের উপর যা আদম এবং তাঁর সাথীদের মাধ্যমে জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল; কিন্তু ফিরিশ্‌তাদের দৃষ্টি সেসব দুস্কৃতকারীদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যারা মানবীয় বুদ্ধি পূর্ণতালাভের পরও খোদাতা'লার অসন্তুষ্টির শিকারে পরিণত হচ্ছে। খোদাতা'লা আদম সৃষ্টির মাঝে মুহাম্মদীয় বৈশিষ্ট্যের ঝলক দেখছিলেন এবং ফিরিশ্‌তারা আবু জাহ্‌লীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা ভেবে কম্পমান ও হতবিহ্বল ছিল। ফিরিশ্‌তারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর যা কিছু ভেবেছিল যদিও তা যৌক্তিকই ছিল, তবে তাদের ঐ আশঙ্কা একটা ভ্রান্তি ছিল যে, এরূপ ব্যবস্থাপনা বিশ্বের জন্য কোথায়ও অভিসম্পাতের না কারণ হয়ে যায়। কেননা কোন ব্যবস্থাপনার সৌন্দর্য, দুর্বলতা প্রদর্শনকারীদের মাধ্যমে নয় বরং তার উত্তম ফলাফল থেকে অনুমান করা যায়। মধ্যবর্তী কোন আশংকার কারণে যদি ভালো কাজ পরিত্যাগ করা হয় তাহলে কোন উন্নতি হতেই পারে না। প্রতিটি বড় কাজে কিছু ঝুঁকি থাকে।' তিনি (রাঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, 'জ্ঞান অন্বেষণকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাণ দিয়ে দেয় তবুও জ্ঞানার্জন পরিত্যাগ করে না। একইভাবে দেশে দেশে সৈন্যরা প্রাণ হারায় কিন্তু নাগরিকেরা সেনা-বাহীনিতে যোগ দেয়া বন্ধ করে না, বা বন্ধ হয়ে যায় না বা স্বদেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফলে যেখানে মানুষের এক অংশ শাস্তিযোগ্য, নৈরাজ্যবাদী ও খুনী সাব্যস্ত হবার ছিল সেখানে অপর এক অংশ খোদাতা'লার প্রিয়ভাজন হবারও ছিল এমনকি ফিরিশ্‌তাদের চেয়েও বেশী উন্নতি করার ছিল। সেই সফলকাম অংশই মানবকূল সৃষ্টি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আর সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কেউ বলতে পারবে না যে, মানব সৃষ্টির এ ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়েছে বরং সত্য কথা হলো, এ উন্নত অংশের একেকজন এত মহান ছিলেন যে, কেবল একজনের খাতিরেই এই ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে রেখে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কোন কোন পুণ্যবান বান্দাকে বলেছেন 'লাও লাকা লামা খালাকতুদ্ দুনইয়া' (ইবনে আসাকির) অর্থাৎ যদি তুমি জন্ম না নিতে তাহলে আমরা বিশজগতের এ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিই করতাম না। এটি হাদীসে কুদ্‌সী এবং মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য আরো সিদ্ধ মহা-পুরুষদেরকেও এ ধরনের ইলহাম করা হয়েছে। সুতরাং এই মহাপুরুষগণ এ কথার সাক্ষী যে, খোদাতা'লার পরিকল্পনাই প্রজ্ঞাপূর্ণ।' (তফসীরে কবির, ১ম খন্ড- পৃষ্ঠা২৮৩-২৮৪)

এরূপ খোদাপ্রেমিক, যারা ফিরিশ্তাদের চেয়ে আল্লাহ্তা'লার পবিত্রতা অধিক বর্ণনা করেন এরপর জগতে তা ছড়িয়ে দেন তারা নিশ্চয় মর্যাদায় তাদের চেয়ে বড় যারা সেই পবিত্রতার ঘোষণা কেবল নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। মানুষের মধ্যে পবিত্রতা ঘোষণাকারীর পরিপূর্ণ নমুনা ও আদর্শ হলেন মহানবী (সা:), যাঁর কথা এখনই বর্ণিত হলো,

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

তিনি গোটা বিশ্ব জগতের ধ্যান-ধারণাকে পবিত্র করেছেন ও তাদের কর্মকাণ্ডকেও পরিশুদ্ধ করেছেন আর আমরা আজ পর্যন্ত সেই 'কুদ্দুস' খোদার প্রকৃত প্রতিফলনের কল্যাণ দর্শন করছি এবং যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

সূরাতুল্ জুমুআ'তে وَيُزَكِّيهِمْ বর্ণিত 'কুদ্দুস' শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) বলেন, **'দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যা বর্ণনা করা হয়েছে তা'হলো 'আল্‌কুদ্দুস', এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,**

তিনি এটিও চান যে, তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রতিটি জিনিষ যেন পবিত্র হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রসূলকে আয়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে আয়াত মানুষজনকে শুনায় আর তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্তা'লার আয়াত শিখিয়ে প্রথমত মানুষের মন ও মননকে পবিত্র করে এবং এরপর এর অধীনে তাদের কর্মকে পবিত্র করে।' (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত (১) ফাযায়েলুল কুরআন (২) আনওয়ারুল উলুম ১১তম খন্ড ১৩০পৃষ্ঠা)

তিনি (রা:) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, **'আল কুদ্দুস'এর মোকাবিলায় রসূলের কাজ উল্লেখ করা হয়েছে -** يُزَكِّيهِمْ অর্থাৎ মানুষকে পবিত্র করেন। জ্ঞানীর পরিচয় কি! এটিই যে, সে অন্যদের শিক্ষা দেয় এবং অন্যরা তার মাধ্যমে জ্ঞানী হয়। আল্লাহ্তালা 'কুদ্দুস', এর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে আগমনকারী; পৃথিবীবাসীকে পবিত্র করেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা:) অপবিত্র লোকদের নিজ হাতে তুলে নেন আর তাঁর অধীনে এসে তারা পবিত্র হয়ে যায়। (রাবোয়া থেকে প্রকাশিত আহমদীয়াত কে উসুল, আনওয়ারুল উলুম ১৩তম খন্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

অতএব ইনি হলেন পবিত্র ও কুদ্দুস খোদার কামেল নবী যাঁর অধীনস্ত হলে সাধারণ মানুষও পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং যদি পবিত্র হতে হয় আর যদি সত্যিকার মু'মিন হতে হয় তাহলে প্রত্যেককে তাঁর অনুগত হবার চেষ্টা করা উচিৎ। আমি যেমনটি বলেছি, পবিত্র কুরআনের যে বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা করার আদেশ এবং যা না করার নির্দেশ রয়েছে এর উপর আমল করতে হবে। আমল না করলে আমরা আল্লাহ্তা'লার দিকে ধাবমান বলে দাবি করতে পারিনা। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর পানে ধাবমান হবার দাবী করতে পারবো না, ফলে 'কুদ্দুসিয়্যত' বৈশিষ্ট্য থেকেও কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারবো না।

আরবের চিত্র অঙ্কন করার পর মহানবী (সা:)-এর পবিত্রকরণ শক্তি যা কুদ্দুস খোদা তাঁকে দান করেছেন সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, **'সে সময়কার আরবের অবস্থা দেখ! চরম নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল, সব ধরনের ভ্রষ্টতা এবং কদাচার ছিল তাদের পরিচয়। এই জাতি কখনও পবিত্র হতে পারে বা তাদের কখনও সুমতি হবে তা কখনও কেউ ভাবতেও পারতো না, বা খোদা প্রেমিক মানুষ হওয়া তো দূরের কথা কেউ একথাও ভাবতে পারতো না যে এরা নূন্যতম চারিত্রিক গুণের অধিকারী হবে। কিন্তু আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি যেমনটি ছিল, যে ব্যক্তি আমার এই প্রিয়ের সাথে সম্পর্ক গড়বে সে পবিত্র হবে বরং রুহুল কুদ্দুসের সাহায্য লাভ করবে। বিশ্ববাসী দেখেছে, এরপর জাতির মাঝে কিরূপ বিপ্লব এসেছে!'**

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'যে ব্যক্তি এ বিষয়টি গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখবে যে, তাঁরা নিজেদের প্রথম বিচরণ স্থল অর্থাৎ তাদের আগ্রহ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম যা তাদের নিকট খুব আকর্ষণীয় মনে হতো তা কিভাবে তারা পরিত্যাগ করলো, আর কিভাবে তারা কামনা-বাসনার অরণ্য পাড়ি দিয়ে নিজেদের প্রভুর সাথে মিলিত হলো; তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারবে, সে সবই ছিল মুহাম্মদ (সা:)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব।'** যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা মুহাম্মদ (সা:)-এর পবিত্রকরণ শক্তিরই গভীর প্রভাব ছিল। **'সেই রসূল যাঁকে খোদাতা'লা মনোনীত করেছেন এবং চিরস্থায়ী দানে সমৃদ্ধ করেছেন সেই মহানবী (সা:)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব দেখ! সাহাবীদের মাটি থেকে তুলে নিয়ে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর ধাপে ধাপে মনোনীত লোকদের পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি মূহুর্ত ও ক্ষণে তাঁদের সম্মান ও পবিত্রতার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিটি মূহুর্তে ও ক্ষণে উন্নত থেকে উন্নততরই হয়েছে। আর মহানবী (সা:) তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর মত পেয়েছেন, যারা তৌহিদ এবং পরহেজগারী বলতে কিছুই জানতো না'** অর্থাৎ, পশুর মত ছিল।

'আল্লাহ্তা'লার তৌহিদ সম্পর্কে তারা যেমন জানতো না তেমনি সংযমশীলতা ও ধার্মিকতা সম্পর্কেও তারা কিছুই অবহিত ছিল না, নোংরামিতে লিপ্ত ছিল এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে জানতো না। নবী করীম (সাঃ) তাদের মানবিক শিষ্টাচার শিখিয়েছেন এবং সামাজিক জীবন বিধান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছেন।' (লন্ডন থেকে প্রকাশিত, নাজমুল হুদা-রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড, ৩১-৩২পৃষ্ঠা)

তিনি (আঃ) পুনরায় বলেন, 'আল্লাহ্ জাল্লা শানহু তাঁর বিশেষ কৃপায় কুরআন শরীফের মধ্যে মা'রেফতে এলাহীর যে তৃতীয় দরজা উম্মুক্ত রেখেছেন তা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি, যাকে বলা যেতে পারে এজাযে তাসিরি বা প্রভাব বিস্তারের নিদর্শন। এটি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই গোপন নয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর জন্মভূমি একটি উপদ্বীপ, যাকে আরব বলা হয় এবং যা সব সময় অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একান্তে পড়ে ছিল; আঁ হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে (একেবারেই) বন্য পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করা, এবং ধর্ম, ঈমান, আল্লাহ্র অধিকার ও মানুষের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হওয়া, শত-শত বছর যাবৎ মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন প্রকার নোংরা চিন্তাধারায় নিমজ্জিত থাকা, ভোগ-বিলাস, নেশা, মদ্য পান, জুয়া ইত্যাদি অপকর্মে চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়াসহ সকল প্রকার পাপের ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। এ সমস্ত পাপাচারই তাদের মাঝে ছিল। অধিকন্তু চুরি,ডাকাতি, রাহাজানি, শিশু-কন্যা হত্যা এবং এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা' অর্থাৎ, ডাকাতি, হত্যা, মেয়েদের মেরে ফেলা, এতীমদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ এবং অন্যের সম্পদ হরণ করাকে কোন অপরাধই মনে করতো না। 'বস্তুতঃ সর্ব প্রকার খারাপ অবস্থা, সব ধরনের অনিয়ম, অজ্ঞতার অন্ধকার ও উদাসীনতা সামগ্রিকভাবে সমগ্র আরবের হৃদয় গ্রাস করে রাখা এমন সর্বজনবিদিত এক ঘটনা যে, সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন গোড়া কোন বিরুদ্ধবাদীও তা অস্বীকার করতে পারে না।' অর্থাৎ এটি এতই প্রকাশ্য বিষয় বিদ্বেষপরায়ণ কোন ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারবে না। 'এছাড়া ন্যায়পরায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, ঐ সকল অজ্ঞ, বন্য, বাচাল এবং অপবিত্র প্রকৃতির মানুষ, যাদের কিছুই জানা ছিলনা; ইসলাম গ্রহণ ও কুরআনকে বরণ করার পর কেমন পরিবর্তিত হয়ে গেল! কিভাবে ঐশী গ্রন্থের প্রভাব এবং নিষ্পাপ নবী (সাঃ)-এর সাহচর্য অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের হৃদয়গুলোকে এমনভাবে পরিবর্তন করে দিল যে, তারা অজ্ঞতার পরিবর্তে ধর্মীয় গুঢ়তত্ত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো আর পার্থিবতার মোহগ্রস্থতার স্থলে ঐশী প্রেমে এমনভাবে বিভোর হলো যে, আপন মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, মান-মর্যাদা এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ সবকিছুই আল্লাহ্ জাল্লা শানহুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিসর্জন দিল। বস্তুতঃ এই উভয় অবস্থা অর্থাৎ তাদের জীবনের পূর্বাবস্থা এবং সেই নুতন জীবন যা ইসলাম গ্রহণের পর তারা লাভ করেছিল, তা পবিত্র কুরআনে এত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তা পাঠ করার সময় একজন সৎ ও পুণ্যবান মানুষের চোখ অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। সুতরাং কি ছিল সেটি যা তাদেরকে এত দ্রুত এক জগত থেকে অন্য জগতে টেনে নিয়ে গেছে। তা কেবল দুটো বিষয়; প্রথমতঃ সেই নিষ্পাপ নবী (সাঃ) এর নিজস্ব পবিত্রকরণ শক্তিতে অত্যন্ত গভীর প্রভাব ছিল। এমনই গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ছিলেন মহানবী (সাঃ) যা না ইতোপূর্বে কখনও কেউ হয়েছে না ভবিষ্যতে কেউ হবে। দ্বিতীয়তঃ সর্বশক্তিমান, অবিনশ্বর ও চিরন্তন খোদাতা'লার পবিত্র বাণী অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিস্ময়কর প্রভাব ছিল যা এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে গভীর অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোতে নিয়ে এসেছে। মোটকথা এটিই হলো কুরআনের অলৌকিক প্রভাব। এগুলো বড়ই অসাধারণ বিষয় কেননা, পৃথিবীতে কোনকালে এমন প্রভাব অন্য কোন গ্রন্থ বিস্তার করেছে বলে কোন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে সক্ষম হবে না। অন্য কোন গ্রন্থ কুরআন শরীফের ন্যায় এরূপ আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে কি?' (লন্ডন থেকে প্রকাশিত- সুরমা চশমা আরিয়া, রূহানী খাযায়েন এর ২য় খন্ড-২৮-৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আমাদের অন্যত্র উপদেশ দিয়ে বলেন, 'তাঁর (সাঃ) পবিত্র প্রভাব বিস্তারের কল্যাণ ধারা বন্ধ হয় নি বরং এখনও তা অব্যাহত আছে। সেই প্রভাব ও সেই কল্যাণ পবিত্র কুরআনে এখনও বিদ্যমান আর খোদাতা'লা এখনও সেই কুদ্দুসই আছেন, তাই যে তাঁর দিকে এগোনোর চেষ্টা করে সে কুদ্দুস বৈশিষ্ট্যের কল্যাণ লাভ করে। এবং তাঁর রসূলের আধ্যাত্মিক প্রভাবও বিদ্যমান, তদুপরি তাঁর গ্রন্থের কার্যকারিতাও তেমনই আছে।' এ যুগে তিনি তাঁর মসীহ্ ও মাহদীর পবিত্রকরণ শক্তির দৃষ্টান্তও আমাদের দেখিয়েছেন এবং দেখাচ্ছেন। এসব কিছুই সেই কুদ্দুস খোদার বৈশিষ্ট্য, যা থেকে আমাদের লাভবান হওয়া উচিৎ। আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

(হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন
মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব, রাযিআল্লাহু আনহু
প্রয়াত ইমাম, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত।

(দ্বিতীয় কিস্তি)

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সংখ্যার ধারাবাহিকতায়)

দরিদ্রদের কল্যাণ সাধনে নানাবিধ পন্থার উদ্ভব

গণতন্ত্র ঃ

এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে আর আমি পূর্বে যেমনটা বলেছি মানুষ এ পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টাও করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। আঠারো শতকের শেষ দিকে বিশ্ব পরিমন্ডলে এর চর্চা বৃদ্ধি পায়। আর জনগণের জাগরূক এই চেতনা পূর্বকালে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার নাম দেয়া হয়েছে গণতন্ত্র তথা Democracy। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এই দরিদ্রতা ব্যক্তি বিশেষ দূর করতে পারবে না তবে রাষ্ট্রই পারে এটা মেটাতে। যেমনটি আমি এই মাত্র বললাম যে লাহোর বা দিল্লী শহরে বসতকারী এক ব্যক্তি কী করে জানতে পাবে যে হিমালয় পর্বতের মালভূমিতে কোন্ গরীব মহিলার শিশু সন্তান ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে অথবা নগরবাসীরা আদৌ কী জানতে পাবে যে, নিভৃত পল্লীবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর কেমন সব বিপদাবলী আপতিত হতে যাচ্ছে! তবে রাষ্ট্র, এ সব অবস্থারই খবর অনায়াসে রাখতে পারে।

অতএব তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ সব দায়িত্ব রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে নেয়া উচিত। তবে রাষ্ট্রের কর্ণধার আর তার পারিষদবর্গ ছাড়াও অন্যান্যদেরও ভূমিকা রাখা আবশ্যক যাতে করে সকলের চাহিদার কথা কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর এভাবে তাদের মাধ্যমে কেন্দ্র সার্বিক অবস্থার খবরাখবর জানতে পারে। এ উদ্দেশ্য অনুযায়ী আগে ছোট ছোট পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে রাজ প্রাসাদে বসে থেকে বাদশাহ্ কী করে ধারণা লাভ করতে পারে যে শাহপুরের ভূমি মালিকদের কিসের চাহিদা রয়েছে? হ্যাঁ, শাহপুরবাসী ভূমির মালিকেরা তাদের নিজ প্রয়োজনের কথা বেশ ভালভাবেই জানে। অনুরূপভাবে ঝংবাসীদের সমস্যার কথা প্রাসাদে বসে থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধার জানতে সক্ষম হবে না। তবে ঝংবাসীরা ভাল করেই জানে তারা কী-সব সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে। কাজেই রাষ্ট্রের কেন্দ্র পর্যন্ত জনগণের চাহিদা, আশা আকাঙ্খার কথা পৌঁছানোর কোন একটা ব্যবস্থা থাকা সমীচীন।

গণতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় সূচিত প্রথম আন্দোলন এভাবে ঘটলো যে প্রজা সাধারণ দাবী করলো সরকারে তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরও অধিকার থাকবে যাতে তারা নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয় জানাতে পারে আর সে সব ব্যাপারে সরকারকে সঠিক পরামর্শও দিতে পারে। কিছুকাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি কার্যকর সাব্যস্ত হয়েছে আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ব্যবস্থায় জনগণ উপকৃত হয়েছে। যদিও এই পদ্ধতিতে জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকতো তবুও এর দ্বারা রাষ্ট্র প্রধান সবার অবস্থা জানতে সক্ষম হতো না। এই পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধিরা এসে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে আর আশ্বস্ত হয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ী ও পেশাদার গোষ্ঠীর সংগ্রাম ঃ

সূচনাকালে এই জনপ্রতিনিধিদের বেশীর ভাগই ভূ-স্বামী তথা জমিদারদের মধ্য থেকে হতো। তারা জমির মালিকদের অধিকারের ব্যাপারেই সোচ্চার হতো। বড় বড় জমিদারেরা এসে রাষ্ট্রের বড় কড় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার কারণে তারা নিজ শ্রেণী গোষ্ঠীর স্বার্থই সংরক্ষণ করতো বেশী। এরপর আরেক গোষ্ঠীর উত্থান ঘটালো ব্যবসায়ী ও পেশাজীবিরা। এ আন্দোলনের নেতৃবর্গ নিজেরা ব্যবসায়ী আর শিক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের নিজ শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারকারী হলো। অতএব, এ আন্দোলনের ফলে যা Liberalism নামে আখ্যায়িত তা দ্বারা ব্যবসায়ী শ্রেণী ও পেশাজীবিরা ভূস্বামীদের মতই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষণ ঘটালো। আর এতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে এমন পরিবর্তন ঘটানো হলো যে ব্যবসায়ী শ্রেণীর অসুবিধাগুলো দূর হলো আর পেশাদার শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে

প্রভাব প্রতিপত্তি ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেলো।

সমাজতন্ত্র (Socialism) ঃ

রাষ্ট্র পরিচালনার উপরোক্ত ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার পর সমাজের অপর একটি স্তরের জনসাধারণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং তারাও একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালায়।

সমাজের এই শ্রেণীটি হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারী তথা চাকুরীজীবিরা যারা শিল্পকারখানায় ও অফিস আদালতে কর্মরত। তারা যখন দেখলো ভূ-স্বামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ব্যবসায়ীদেরও নিজেদের অধিকার লাভ হয়েছে শিল্পপতিরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে অংশীদারিত্ব লাভ করেছে। এসব দেখে শুনে, তারাও দাবী উত্থাপন করল যে, 'আমাদের দুঃখ দুর্দশার ব্যাপারে তোমরা উদাসীন এজন্য আমরাও এখন সরকারে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজেদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবো'। এই বলে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা নিয়ম মাফিক নির্বাচনের মাধ্যমে আবার ক্ষেত্রবিশেষে জোর খাটিয়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধি দাঁড় করাতে শুরু করে। ইদানিং (১৯৪২) সমাজতন্ত্র খুবই প্রভাব বিস্তার করছে এটা প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনেরই নাম, যে আন্দোলনে শ্রমিকদের স্বার্থকে পূঁজিপতিদের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজেদের দখলে নিতে চায় এবং তারা মনে করে যে এভাবেই শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র (International Socialism) ঃ

পরবর্তীতে এ আন্দোলন আরও বেগবান হওয়ায় তারা নিশ্চিতরূপে বলতে শুরু করলো যে এ আন্দোলনই জনগণের জন্য কল্যাণকর। তবে এর প্রভাব কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এটা কোন ভাবেই মঙ্গলজনক হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সংস্কার আমরা করে নিলাম বটে কিন্তু ফ্রান্সের জনগণ ক্ষুধার তাড়নায় ধুকে ধুকে মরতে থাকলো, তবে এটা কি আমাদের জন্য কোন আনন্দদায়ক বিষয় হবে? এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের দরিদ্র ও শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করতে হবে। দৃশ্যত বলা হয়ে থাকে যে, সংস্কারের পরিধি আমরা বাড়িয়ে চলছি কিন্তু প্রকৃত সত্য এটা ছিলো যে এ আন্দোলনের ফলে কোন এক দেশের বিত্তবানরা ক্ষতিগ্রস্থ হলে অপর দেশের বিত্তবানেরা তাদের দেশেও এ আন্দোলনের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে সে জন্য এ আন্দোলনের বিরোধীদের সাহায্য সহযোগিতা যোগাতে থাকে। ফল এই দাঁড়ালো যে, শ্রমজীবি খেটে খাওয়া সাধারণ জনগণও স্থির করলো যে বিভিন্ন দেশে দরিদ্র জনগণের মধ্যেও পারস্পরিক গভীর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হোক। যতক্ষণ এটি করা না হচ্ছে ততক্ষণ সফলতা লাভ করা কঠিন। এভাবে সমাজতন্ত্র পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করলো অর্থাৎ শ্রমজীবি মানুষেরা কেবল স্বদেশের অর্থাৎ শুধু নিজেদের খবরই রাখতো না বরং অন্যান্য দেশের দরিদ্রদের খবর রাখতেও শুরু করলো।

দরিদ্রদের উন্নয়নকল্পে কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এর তিনটি নীতি ঃ

ইহুদী বংশোদ্ভূত কার্লমার্ক্স জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে ইহুদী হলেও ধর্মীয় ভাবে তিনি ছিলেন খৃষ্টান। দরিদ্রতার এই সংকট নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন। পর্যালোচনান্তে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোন যে, সামাজিক কাঠামোতে ধীরে ধীরে সংস্কার করে শিল্পপতিদের উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবি দরিদ্র মানুষদের অধিকার আদায়ের যে নীতি অলম্বন করা হচ্ছে তাতে তো অর্ধশত বা শতাব্দীকাল এমনকি হাজার বছরেও সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না। প্রকৃত দুঃখ এই যে, যে ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা রয়েছে তারা নিজ থেকে এ সংস্কার করবে না। অতএব, ইপ্সিত সংস্কার লাভের এটাই সহজ পদ্ধতি যে ,শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া হোক। অর্থাৎ তার মতে এটা কি কোন পদ্ধতি হতে পারে যে, কোন জায়গায় সরকার খাল খনন করতে না চাইলে শতবর্ষ ধরে সেই খালের জন্য জনগণকে দাবী ও চেষ্টা চালিয়েই যেতে হবে আর সরকারও নিজে থেকে এ খাল খননের কাজ হাতে নিবেই না। কিংবা অমুক শিল্প কারখানায় যেহেতু সংস্কার হয়নি এজন্য সরকারের উপর এ ব্যাপারে বছরের পর বছর ধরে চাপ প্রয়োগ করতে থেকে সময় নষ্ট করা হবে। সোজা কথা এই যে, সরকার হাতে নিক আর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হোক অর্থাৎ মার্ক্স এই নীতি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা ছাড়া আমরা সামগ্রিক সংস্কার সাধন করতে পারবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিচ্ছি আর যতক্ষণ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা আমাদের করায়ত্ব না হচ্ছে ততদিন নাগাদ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কোন সংশোধনই করা সম্ভব নয়।

মার্ক্সীয় মতবাদের প্রথম নীতি ঃ

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম শাখা হলো মার্ক্সীয় মতবাদ। বল প্রয়োগ করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার এটি একটি পন্থা। অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে

মুক্তি অর্জনের পূর্ব শর্ত হলো রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা সংস্কার সাধন। অতএব এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে মার্ক্সীয় মতবাদে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এমন কারণের জন্যই সমাজতন্ত্রীরা সফলতা লাভ করতে পারেনি, কেননা তারা বিত্তবানদের সাথে মিলেমিশে কাজকর্ম শুরু করে, যেখানে কিনা বিত্তবানদের আধিপত্য দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। এজন্যই তাদের পক্ষ অবলম্বন করলে দরিদ্রদের অধিকার কিছুই অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

মার্ক্স-এর দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে মিল মিশ হওয়াটাও ভুল। তার দৃষ্টিতে বিত্তবানদেরকে এমনটাই ভাবা উচিত যে তারা মানুষ নয়, এজন্য যতটুকু ক্ষমতা লাভ গরীবদের সম্ভব তা যেন তারা নিজেদের করায়ত্ব করে নেয়।

মার্ক্সীয় মতবাদের দ্বিতীয় নীতি ঃ

মার্ক্সীয় মতবাদের দ্বিতীয় নীতিতে তিনি এই পন্থা উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগ করা উচিত। বর্ণবৈষম্য তৈরী করে আক্রমণ চালানো আর চড়াও হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল – এই ছিল কার্ল মার্ক্সের অন্যতম শিক্ষা যা থেকে 'বলশেভিজম' (Bolshevism)-এর উদ্ভব হয়েছে।

মার্ক্সীয় মতবাদের তৃতীয় নীতি ঃ

মার্ক্সীয় মতবাদে আরও বলা হয়েছে যে, সম্পদশালী ভুস্বামী ও ব্যবসায়ীরা একদিকে বিশাল শক্তিধর হয়ে উঠেছে আর অপরদিকে শ্রমিকরা এতই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে যে বর্তমান শাসকদের উপর চাপ প্রয়োগে সমর্থ হলেও তারা নিজেদের অধিকার আদায়ে বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না। প্রসিদ্ধ এক কৌতুক রয়েছে যে, এক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক সহিস ছিল যে মাসে আট/দশ রুপী মজুরী পেতো। কেউ একজন তাকে একবার বুঝালো যে, আজকাল যেখানে প্রত্যেকে মাসে চল্লিশ/পঞ্চাশ রুপি করে মজুরী পাচ্ছে সেখানে তুই মাত্র আট/দশ রুপিতে খেটে যাচ্ছিস? তোর মনিবকে বলিস না কেন যে বেতন বাড়িয়ে দিন। সে বলতে থাকলো যে,'আমি কি করে বলবো?' এতে পরমর্শদানকারী ব্যক্তিটি বললো, 'তুই তার কেনা গোলাম নাকি, তোর বেতন যদি বাড়ায় তো ভাল নইলে অন্য কোথাও কাজ নিবি।' অনেক করে বুঝানোর পর এমনটা করতে সে প্রস্তুত হলো আর মনোস্থির করে নিল যে আজ মনিব এলে পরে সাথে সাথে পরিস্কার তাকে জানিয়ে দেবে যে, 'হয় আমার বেতন বাড়িয়ে দিন নইলে আমি চাকুরি ছেড়ে দিচ্ছি'। ওই মূহুর্তে তার মনিব ঘোড়ায় চড়ে অন্যত্র কোথায়ও বেরিয়েছিল। যখন তিনি ফেরত এলেন সহিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আর বললো, 'মনিব! একটা কথা ছিল'। মনিব বললো, 'কি কথা'? সহিস বলতে শুরু করলো, সবাই বেতন বেশী পাচ্ছে আর আমার বেতন খুবই কম। তাই, হয় আমার বেতন বাড়ান নইলে........ এতটুকু বলতেই তার মনিব চাবুক তুলে কষে তাকে এক মার লাগালো আর বললো, 'নইলে আর কি .....।'এবার সহিস বললো 'নইলে আট রুপিতেই ধৈর্য ধরবো, কী আর করবো!' আর পরামর্শদাতার সমস্ত কথাই সে ভুলে বসলো অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছিল যে, 'নইলে আমি চাকুরী ছেড়ে দেবো' কিন্তু চাবুকের এক ঘা খেতেই বলতে লাগলো 'নইলে আট রুপিতেই ধৈর্য ধরবো কী আর করবো।'

দীর্ঘকাল দাসবৃত্তির পরিণাম ঃ

অতএব, দীর্ঘকাল দাসবৃত্তি অবলম্বনের ফলে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, মুচি-মেথর-চামারদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে যতই চেষ্টা করা হোক, আর তাদের যতই বুঝানো হোক শেষ পর্যন্ত তারা এমন এক মুচকি হাসি দেবে যে আমাদেরই বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে–আর বলবে যে, 'প্রভূ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন! তাতে কী আর কোনো রদ-বদল হতে পারে।' তাদের দৃষ্টিতে সংশোধন ও সংস্কারের এই যে ধরনের কথা বলা হচ্ছে–এদের সবার মাথা খারাপ। কার্ল মার্ক্স এটাই বলেছেন যে এই লোকদের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার নয়। সাধারণ জনগণকে যদি অধিকার/ক্ষমতা দেওয়াও হয় তবুও তারা ভয় পেয়ে অস্ত্র রেখে দেবে। এজন্য শুরুতে শ্রমিকদের একান্ত সহমর্মীদের মধ্য থেকে কাউকে একনায়কত্ব প্রদান করা অত্যাবশ্যক। তিনি জনগণকে যখন সুশৃঙ্খল করে নেবেন, শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবেন তাদের মধ্যে বিদ্যমান শ্রেণী বৈষম্যকে বিদূরীত করবেন আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত করে দেবেন যে, তারা ধনাঢ্যদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস রাখে এমন অবস্থায় উপনীত হলে পর, তখন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে গণপ্রজাতন্ত্রের কাছে সোপর্দ করে দেয়া উচিত কিন্তু এর পূর্বে নয়। নইলে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য লেনিন ও তার সহযোগীদের প্রচেষ্টা ঃ

পরিশেষে মার্কস মৃত্যুমুখে পতিত হলো। দরিদ্রদের উপর নিপীড়ন চরমে পৌঁছলে পর এক রাজনৈতিক দল দাঁড়িয়ে গেল যারা মার্ক্সীয় নীতি অনুযায়ী জনগণকে একতাবদ্ধ করতে শুরু করে দিল। মার্ক্সীয় নীতিতে একতাবদ্ধ এইসব লোকদের একজন হলো লেনিন, যে সাধারণ জনগণ থেকে উত্থিত হওয়া রাশিয়ার প্রথম স্বৈরশাসক। লেনিন ও তার সহযোগীরা মার্ক্সীয় মতবাদকে অধিকতর সংবিধিবদ্ধ রূপ দেয়। কিছু

কাল পর্যন্ত এরা সবাই মিলেমিশে কাজ করে গরীবদের এই বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "তোমরা বস্ত্রহীন অবস্থায় চলাফেরা করছো, ক্ষুধার তাড়নায় কাতরাচ্ছো অপরদিকে এই দেশেই বিত্তবানরা আরাম-আয়েশে ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে জীবন যাপন করে যাচ্ছে'। তারা আরও বলে, 'এটা কেমনতর ন্যায় বিচার- শিল্পকারখানায় কর্মরত এক শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ হার ভাঙ্গা খাটুনী খেটে দিনান্তে এতই সামান্য পারিশ্রমিক পায় যে, যা দ্বারা অতিকষ্টে তার নিজের, নিজ স্ত্রীর আর সন্তান-সন্ততির কোনক্রমে ক্ষুধার কষ্ট ঘুচে। অপর দিকে একই শিল্প কারখানার মালিকের ছেলেপুলেরা নামী-দামী সব পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় আর ভালো ভালো সব খাবার খায়।" এভাবে তারা সারা দেশ জুড়ে উত্তেজনা বাড়িয়েই চলে। এতে করে ধনাঢ্যদের বিরুদ্ধে বহু দল সংগঠিত হয়ে গেল।

বলশেভিক (Bolshevik) ও মেনশেভিক (Menshievik) পার্টির সূচনা ঃ

তাদের কতৃত্ব যখন বেড়ে গেল তারা ভাবলো আমরা এখন এমন অবস্থানে পৌঁছে গেছি যে দ্রুতই আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হতে যাচ্ছে। এজন্য তারা এক সভা ডাকলো আর এর উদ্দেশ্য এটি নির্ধারণ করলো যে, রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পর কিভাবে তা পরিচালিত হবে তা ঠিক করতে নিয়ম পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে নেওয়া হোক। এ সভায় তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। Martov (মার্টভ), পার্টির অভ্যন্তরে লেনিনের মতই প্রভাবশালী এক নেতা ছিল, তার লেনিনের সাথে মতবিরোধ খুবই বেড়ে গেল, এমনকি তারা বিভাজিত হয়ে দুই দলে পরিণত হলো। যার একটি আখ্যায়িত হলো বলশেভিক নামে যার অর্থ হলো 'সংখ্যাগরিষ্ঠ'। কেননা লেনিনের পক্ষে অবিভক্ত দলের বেশীর ভাগ সদস্য ছিল তাই তার দলের নাম 'বলশেভিক'। আর মেনশেভিক এর অর্থ হলো সংখ্যায় অল্প/কম। কেননা, তার (লেনিনের) বিরুদ্ধে সংখ্যায় তুলনামূলক কম সদস্য ছিল, এজন্য মার্টভের দল 'মেনশেভিক' নামে আখ্যায়িত হলো।

শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেনিন ও মার্টভের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ঃ

প্রথম মতভেদ ঃ লেনিন মার্ক্সের বেশী ভক্ত ছিল। সে এ নীতি নির্ধারণ করেছিল যে, আমাদের অন্যান্য দল থেকে পৃথক থাকা উচিত নইলে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সঠিকভাবে পৌঁছতে সক্ষম হবো না। কিন্তু মার্টভের ধারণা এই ছিল যে, শক্তি সঞ্চয় করার পূর্বে আমাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচী সম্পন্ন দলগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। যদিও লেনিনের মতবাদ এর বিপরীত ছিল যে- আমরা অন্যদের সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবো না, আমরা যা কিছু লাভ করবো নিজেদের শক্তিতেই অর্জন করবো, কারও দয়ায় বা অনুগ্রহভাজন হয়ে নয়। অন্য কথায় লেনিনের নীতি ছিল, 'আমরা অন্যদের সাথে আপোষ রফা করবো না। আমরা সঠিক রাস্তায় আছি, আর আমাদের দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে আমরা শেষ পর্যন্ত সফল হবই'।

দ্বিতীয় মতভেদ ঃ লেনিনের মতবাদে এটাও ছিল যে, শুরুতে এক নায়কতন্ত্র (Dictatorship) ছাড়া দেশ চলবে না। কিন্তু মার্টভের মতে শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আসলে মার্টভ ভাবতো যে এক নায়কতান্ত্রিক নেতা হলে তো লেনিনই হবে আমার তো কোন সম্ভাবনা নেই, তাই শুরু থেকেই সে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতো।

তৃতীয় মতভেদ-মৃত্যুদন্ডাদেশ সম্পর্কিত ঃ

মার্টভ আরও চাইতো যে- নূতন সরকারে সমাজতন্ত্রের নীতিমালার আওতায় 'মৃত্যু দন্ডাদেশ'এর আইন সমপূর্ণরূপে বাতিল করা হোক। কিন্তু লেনিন, এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলে যে, আমি স্বীকার করি যে ফাঁসির শাস্তি থাকা উচিত নয়, তবে এখনই যদি এটা আইনে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তবে 'জার'কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা যাবে না। আর লেনিনের ধারনায় 'জার' ক্ষমতাচ্যুত হয়েও যদি বেঁচে থাকে তাহলে নব রাষ্ট্র ব্যবস্থা সচল থাকবে না। এজন্য লেনিনের মতে কেবল জারের প্রাণ নাশের জন্য হলেও 'মৃত্যু দন্ডাদেশ' আইনের আবশ্যকতা রয়েছে, সেজন্য এ আইন কার্যকর থাকা উচিত। 'জার' এর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতা তার অন্তরে এত চরমভাবে বিরাজিত ছিল যে সে বলে, "শুধুমাত্র 'জার'কে ফাঁসি কাষ্ঠে লটকানোর জন্যে হলেও এ আইন অবশ্যই বলবৎ রাখা উচিত"। মতভেদসমূহের পরিণতিতে লেনিন বেশী ভোট পেলো আর তার সহযোগীরা দল পরিচালনার কর্তৃত্ব লাভ করলো এবং নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে বলশেভিক নামে পরিচিত হলো। অপর পক্ষে তাদের বিরোধীরা নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য মেনশেভিক আখ্যায়িত হলো।

'জার' ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রথমে মেনশেভিক'রা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে নেয়, কেননা রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে (মেনশেভিকদের) নিজেদের জন্য অধিক সুবিধাজনক ভেবেছিল। পরবর্তীতে বলশেভিকরা তাদের পরাভূত করে নিজেদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

[চলবে]

ভাষান্তর ঃ **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

মাহিল্লার আসীরানে রাহে মাওলার ঈমানবর্ধক বৃত্তান্ত

ওয়া কাআয়্যেম্মিন্ আয়াতেন্ ফিস্‌সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ইয়ামুররূনা আলায়হা ওয়া হুম আনহা মু'রেযুন।

অর্থাৎ আকাশসমুহে ও পৃথিবীতে কত কত নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে যেগুলির পাশ দিয়ে তারা ঐগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও অনীহা প্রকাশপূর্বক অতিক্রম করে থাকে (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬ আয়াত)।

অবশ্য দলীল প্রমাণ দ্বারা মানুষের মুখ বন্ধ হয়, বিবেকবান মানুষের বিবেক বিষয় গ্রহণ করে এবং এইরূপই হওয়া উচিত বলে স্বীকার করে লয়, কিন্তু নিদর্শনাবলী দ্বারা মানুষের মন পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ হয়, সংশয় মুক্ত হয়ে শুধু পবিত্রই হয় না পরন্তু উজ্জ্বল হয়। নিঃসন্দেহে কুরআন বিবেকের চিন্তা বোধোদয়ের জন্য অকাট্য দলীল প্রমাণ এবং মনের পবিত্রতা ও ঔজ্জ্বল্যের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ ধনভান্ডার ও অফুরন্ত আকর বিশেষ; যা ভূমিতেও পরিলক্ষিত এবং আকাশেও বিদ্যমান।

পৃথিবীতে মহাপুরুষ ও নবী-রসূলদের আবির্ভাব কালে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর প্রচন্ড বারিধারা বর্ষিত হয় কিন্তু এই বারিধারা বর্ষিত হলেও প্রস্তর প্রস্তরই থেকে যায়; আর উর্বর সতেজ মাটি নানান সুন্দর ফুলে ও সুমিষ্ট ফলে সুশোভিত হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় হুযূর আকরামের মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বাধিক বেশী নিদর্শন ও রহমত বারি বর্ষিত হয়, তখন মাটির মানুষ হযরত আবু বকর এতে খুব তৃপ্ত ও প্লাবিত হন, পরম সুন্দর ফুলে-ফলে বলিয়ান হন; কিন্তু তাঁর পার্শ্বে অবস্থানকারী পাষন্ড আবু জাহল ঐ নিদর্শন ও রহমত বারি বর্ষিত হওয়ার পরও কঠিন প্রস্তর অবস্থায়ই থেকে গেল। অতএব বুঝা গেল যে আকাশে ও পৃথিবীতে বিস্তৃত অজস্র নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করার জন্য সৎ মন ও সৎ চিন্তা এবং মহৎ উদ্দেশ্য থাকা দরকার। মোট কথা নবীর আবির্ভাবও আসলে লায়লাতুল কদরের অন্তর্গত। যার ফলে সহস্র সহস্র ফিরিশ্‌তা ও রূহুল কুদ্দুস নাযেল হয় যারা উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ কাজ করে। যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এরশাদ করেছেন ঃ

সাও সাও নিশাঁ দিখা কর লাতা হ্যায় ওহ্ মুঝকো জো উস্‌নে ভেজা বাস্ মুদ্দা য়াহী হ্যায়।

অর্থাৎ শত শত নিদর্শন দেখিয়ে তিনি নিজ বান্দাদেরকে কাছে ডেকে আনেন; আর তিনি যে আমাকে পাঠালেন এরও মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল এটাই (দুররে সমীন)।

সুধী পাঠক বৃন্দের কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম, পরে সময় মত রাঙ্গামাটির মাহিল্লার আসীরানে রাহে মাওলার ঈমান বর্ধক বৃত্তান্ত বিস্তারিত লিখবো। বস্তুতঃ বিস্তারিত বর্ণনা এখনো সম্ভব নয়; তাই চুম্বক চুম্বক ঘটনাগুলিই বলবো।

মাহিল্লার আসীরানে রাহে মাওলার বৃত্তান্ত বর্ণনা আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে যারা ব্যাপৃত ও নিয়োজিত তাদের সাহায্য সহায়তা করার আল্লাহ্ তাআলা যে দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেছেন তা অবশ্য সংক্ষেপে এস্থলে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

১। অর্থাৎ হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও যদি তুমি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না। স্মরণ রেখো আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন.........(৫ঃ ৬৮)।

২। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁর (দীনের) সাহায্য করবে (২২ঃ৪১)।

৩। অর্থাৎ মু'মিনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয (৩০ঃ৪৮)।

মাহিল্লার আসীরানে রাহে মাওলার বৃত্তান্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহুল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাসরিহিল আযীয মার্চ ২০০৭ সালে অনুগ্রহপুর্বক যখন আমাকে আহমদীয়া মুসলিম জামআত বাংলাদেশের নওমুবাঈন এর তা'লিম ও তরবীয়্যতের এডিশনাল সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পন করলেন

তখন থেকে আমি চিন্তা করছিলাম এবং দোয়া করে যাচ্ছিলাম আল্লাহ্ তাআলা যেন এই গুরু দায়িত্ব সুচারু ভাবে পালন করার তৌফীক দান করেন। ঠিক এই সময়েই চট্টগ্রামের মুরব্বী মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব দরখাস্ত পাঠালেন যে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূর পার্বত্য অঞ্চলে মাহিল্লায় দুই বৎসর পুর্বে একটি নতুন জামাআত কায়েম হয়েছে যেখানে প্রায় দুই শত নওমুবাঈন রয়েছেন, তাদের তা'লীম ও তরবীয়্যতের উদ্দেশ্যে তরবীয়তী ক্লাসের আয়োজন করা খুব দরকার। সুতরাং মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেব ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে মাহিল্লায় চারদিন ব্যাপী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হলো। এই উদ্দেশ্যে আমি ১৬ই মে ২০০৭ তারিখে ৪টায় ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হই এবং রাত ১১টায় চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে পৌঁছে যাই; ষ্টেশনে আব্দুল মজিদ খাদেম উপস্থিত ছিলেন অথচ তাঁর স্টেশনে থাকার কথা ছিল না; আসলে তাঁর এক মেয়ে নরশিংদী হতে পরবর্তী ট্রেনে চট্টগ্রাম আসার কথা ছিল তাই তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে দেখেই আমার কাছে চলে আসলেন এবং প্রাথমিক সালাম কালামের পর আমার ব্যাগ ধরে আমাকে বাস ষ্ট্যান্ডে নিয়ে আসলেন এবং চকবাজারের বাস দেখিয়ে দিলেন; ইতোপূর্বে আমি এদিকে আসিনি, তাই এই পথ আমার জানা ছিল না; এই যে অপ্রত্যাশিত সাহায্য সহযোগিতা, এটা আল্লাহ্র পথে সফরে আল্লাহ্র অদৃশ্য সাহায্যের প্রথম নিদর্শন, যদিও ছোট বিষয়ই হউক না কেন ; কেননা অজানা পরিবেশে ছোট ভুল হলেও কোন কোন সময় বড় খেসারত দিতে হয়। যাই হউক, আমি বাসে বসলাম, সঙ্গের সীট খালি ছিল, একটু পরেই সেই সীটে এক যুবক এসে বসলো, যার চেহারাতে সুন্দর দাঁড়ি। মন চাইল, পরিচয় নেই, পরিচয় দেয়ার পর আমারও পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আমি একজন ইসলাম ধর্মের সেবক, চকবাজার আঞ্জুমানে আহমদীয়া যাব; তিনি বলতে লাগলেন, আমারও বড় ভাই দীনের সেবা করেন। আপনি যেখানে নামবেন তার কিছু আগে আমি যাব। বাসের কন্ডাক্টরকে যখন আমি ভাড়া দিতে গেলাম তখন তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন যে, ভাড়া আমি দেব; আমি অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে ভাড়া দিতে দিলেন না, তিনিই ভাড়াটা দিয়ে দিলেন। আমি চিন্তা করলাম, এই ক্ষণিকের সাক্ষাতে একজন অজানা-অচেনা যুবকের গভীর অন্তরস্থলে এত গাঢ় মহব্বত আমার জন্য রহমান আল্লাহ্ই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত; এটা ছিল আল্লাহ্র পথে সফরে আল্লাহ্র সাহায্যের দ্বিতীয় নিদর্শন যা পরবর্তী সফরের সফলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছিল।

১৭মে প্রত্যুষে জনাব মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব (৩০) পিতা ফযলুর রহমান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ চট্টগ্রাম, জনাব মুনিরুজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব (২৬) পিতা জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব মুয়াল্লেম চট্টগ্রাম ও খাকসার আব্দুল আযীয সাদেক (৭০) পিতা সাহেব আলী সাহেব আমরা এই তিনজন মাহিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মাহিল্লাতে পুর্ব হতে জনাব যিকরে ইলাহী সাহেব (২৪) মুয়াল্লেম ও মাষ্টার মুযযাম্মেল হক (২৭) সাহেব জামাআতে তা'লীম ও তরবীয়্যতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে মাহিল্লা পাহাড়ের পর পাহাড় এবং পাহাড়ী নদীর পর নদী অতিক্রম করার পর প্রায় ৭০ (সত্তর) মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে এলে স্বতঃস্ফূর্তই বলতে হয় যে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের উপর অবতীর্ণ এই ইলহামটি পূর্ণ হয়েছে যে, **"আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিব।"** চট্টগ্রাম থেকে রঙ্গামাটি পর্যন্ত মোটর গাড়িতে প্রায় আড়াই তিন ঘন্টা সফর, রাঙ্গামাটি হতে মাহিল্লা পর্যন্ত লঞ্চে প্রায় চার ঘন্টা সফর করতে হয়। ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সফর। সফরটি যে কত আনন্দদায়ক, মনোমুগ্ধকর তা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সড়কের দুই পার্শ্বেই ঘন গাছ গাছড়া খুবই সুন্দর লাগছিল, কিন্তু রাঙ্গামাটি হতে মাহিল্লার পথে লঞ্চের সফরটি পাহড়ী নদ নদীর মধ্য দিয়ে সফরটি ছিল অপূর্ব অবর্ণনীয় মনোরম সফর। ঠিক দুপুরে উজ্জ্বল আলোতে সবাইকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চাকমা ও অ-চাকমা বিভিন্ন রং-বেরংয়ের মানুষ দ্বারা ভরা আমাদের লঞ্চটি মৃদুমন্দ গতিতে এমন পাহাড়ী নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, যা ছিল প্রচুর গভীর কিন্তু চওড়ায় অনেক কম তাই দুই পাশের পাহাড়ে প্রাকৃতিক

উদ্ভুত ঘন ঘন বৃক্ষরাজি তার এক আজব বাহার দেখছিলাম, পরম নিপুন শিল্পী আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন লক্ষ্য করছিলাম গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলাম আর বার বার হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলায়হেস সালামের নযমের কতক ছন্দ মনে পড়ছিল–

হ্যায় আজব জালওয়া তেরী কুদরাতকা পেয়ারে হার তরফ;

জিস্‌ তরফ দেক্ষেঁ ওহী রাহ্‌ হ্যায় তেরে দীদার কা।

তেরী কুদরতকা কুইভী ইন্তেহা পাতা নাহিঁ।

কিস্‌সেখুল্‌ সাকৃতা পেচ্‌ ইস্‌ উক্‌দায়ে দুশ্‌ ওয়ারকা।

অর্থাৎ হে প্রিয়! সবখানে তোমার আশ্চর্য মহিমাবিকাশ বিদ্যমান;

যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাই পথ তোমারি দর্শনে।

তব মহিমার কেহ নাহি পায় পার কিনারা;

কে পারে খুলিতে কঠিন রহস্যাবলীর এই গ্রন্থি।

পথিমধ্যে দুই ঘন্টার জন্য আমরা একটি বড় বন্দরে নেমে পড়লাম, ক্লাসের জন্য চাল ডাল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী কিনে নিলাম এবং মাহিল্লার উদ্দেশ্যে একটি ট্রলারে রওয়ানা হলাম। রাত আটটায় আমরা মঙ্গলমতে পৌঁছে গেলাম। মাহিল্লা জামাআতের মসজিদে আমাদের মোয়াল্লেম যিকরে ইলাহী ও মাষ্টার মুযাম্মেলহক ও আরো কিছু খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন, যারা তাড়াতাড়ি করে মসজিদের উত্তরপার্শ্বে আমাদের সব মাল পত্র সুন্দর করে রেখে দিলেন; আমাদেরকে হাত লাগাতে হলো না। রাতেই আশে পাশের কিছু আহমদী ভাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চলে আসলেন, জাযাহুমুল্লাহো। পরবর্তী দিন শুক্রবার ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য আশপাশে ঘুরে দেখলাম, কিছু সমতল ভূমি কিছুটা টিলা কিছু জলাশয় সম্বলিত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সুন্দর পার্বত্য অঞ্চল, যাকে ঘেঁষে একটি পার্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছে, যাতে যান্ত্রিক নৌকা চলাচল করে। গ্রামটিতে চার পাঁচ হাজার লোক বসবাস করে, তারা সকলেই জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করেছে, এদের মধ্যে প্রায় তিনশত আহমদী, আলহামদুলিল্লাহ্‌। আহমদীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও প্রভাবশালী। এত পাহাড়, অসংখ্য নদ নদী ও জঙ্গল পাড়ি দিয়ে দেশের কোণায় মাহিল্লা অবস্থিত। এর অবস্থান দেখে হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালামের উপর অবতীর্ণ এই ইলহামটি আমি বার বার স্মরণ করছিলাম ঃ

"আমি তোমার প্রচারবাণীকে ভূমির প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।"

মাহিল্লার বেলায়ও আমরা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখছিলাম; আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আবদিকাল মসীহেল মাওউদ ওয়াল খোলাফায়ে ওয়াল আসহাবে আজমাঈন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

এ স্থলে মাহিল্লায় আহমদীয়াতের সূচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'টি কথা বলে রাখি। এখানে সর্ব প্রথম আজ হতে আড়াই বৎসর পূর্বে এখানকার অধিবাসীনী মোহতারমা রাবেয়া বেগম সাহেবার মাধ্যমে আহমদীয়াতের বীজ বপন হয়, যিনি বর্তমানে চট্টগ্রামে বসবাস করছেন। তাঁর মাধ্যমে গ্রামে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছার পর আট দশজন সৎপ্রকৃতির লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন; যার ফলে সত্যের বিরোধিতার চিরাচরিত নিয়ামানুযায়ী নব দীক্ষিত আহমদী ভাই বোনদের উপর চরম যুলুম অত্যাচারের এক তুফান নেমে আসলো, উৎপীড়ন ও নির্যাতনের রোলার চালানো হলো; কিন্তু নব দীক্ষিত আহমদী ভাই বোনেরা সব সহ্য করে নিজেদের দৃঢ় ঈমান এবং বীরত্বের পরিচয় দিলেন। এখানকার ইতিহাস রচনাকারী কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি ঃ

১। জনাব রিয়াযুদ্দীন সাহেব, তিনি এখানকার স্বচ্ছল এবং সমঝদার লোকদের মধ্যে একজন ; বর্তমানে তিনি জামাআতের প্রেসিডেন্ট।

২। জনাব কবির সরদার সাহেব, একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি;

৩। জনাব শোকুর আলী সাহেব; বড় ধৈর্যশীল সদা হাস্যমুখ এবং নম্র ও বিনয়ী লোক;

৪। আয়নাল হক সাহেব এবং তার মা ও ভাইয়েরা; তারা মসজিদের জন্য স্থান দান করেছেন।

এমন আরো অনেক নিষ্ঠাবান আহমদী

ভাই বোন আছেন যাদের কুরবানীর ফলে আজ মাহিল্লায় দুই শতাধিক মুখলিস ভাই বোনদের একটি জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মসজিদে মক্তবের ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬০ জন আহমদী ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। ১৮ মে ২০০৭ ছিল শুক্রবার, ভোর থেকেই নও মুবাঈনদের তা'লীম ও তরবিয়্যতের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রকাশ থাকে যে মাহিল্লার নবদীক্ষিত সকল আহমদীই নওমুবাঈনদের অন্তর্গত। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বিশেষ রীতি নীতি, যা ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত, এই নতুন জামাআতে তা এখনো প্রচলিত না হলেও অদুর ভবিষ্যতে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। মসজিদে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করে তাদের তা'লীম ও তরবিয়্যতের এবং তাদের আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদেরকে জুমুআর নামাযে খুতবাতে শামিল করার জন্য, ইসলাম তথা কুরআনের তাকীদপূর্ণ আদেশ রয়েছে। তাই বিশ্বের সকল দেশে ও সকল জাতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত এই আদেশ পালন করে পর্দার মধ্যে মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায বিশেষ করে জুমুআর নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করে আসছে। মাহিল্লাতে এ ব্যবস্থা ছিল না, তাই মোয়াল্লেম যিকরে ইলাহী সাহেব, মাষ্টার মুযাম্মেল হক সাহেব এবং কিছু খোদ্দামকে দিয়ে ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে দেয়া হলো যে আজ থেকে মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায পড়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা থাকবে। মহিলাদের তরবিয়্যত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতি হতে পারে না।

কর্মসূচী অনুযায়ী যথারীতি এশা পর্যন্ত তরবিয়্যতী ক্লাস জারি থাকলো। ক্লাসে উপস্থিত ছিল ৫০/৬০ জন। সকলের মধ্যেই উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল।

যেহেতু খাকসারের এখানে প্রথমবার আসা, তাই বাদ আসর সময় করে আমি কয়েকজন আহমদী ভাইদের সাথে নিয়ে গ্রামে বিভিন্ন বাড়ী ঘর ও আহমদীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয় করে নিলাম। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর ছেলের একটি ভাল দোকান এবং বসার ভাল ব্যবস্থা। সেখানে আট দশজন যুবক বসেছিলেন, তাদের সঙ্গে হাত মিলালাম, সংক্ষিপ্ত সালাম কালামের সময় আমাকে বলা হলো যে তারা সকলেই পুলিশ ক্যাম্পের মানুষ, পাবলিক পোশাকে এখানে বসে মুক্ত বাতাস খাচ্ছেন। দোকানটির সঙ্গে একটি চায়ের দোকান, যেখানে আট দশজন লোক বসে চা পান ও খোশ গল্প করছিলেন, আমরা তাদের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয় জানলাম, তাদের মধ্যে পুলিশ ক্যাম্পের সুবেদার মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব ছিলেন, যার সাথে সৌহার্দপূর্ণ করমর্দন ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হলো। পরে জানতে পারলাম যে তিনি আমাদের জামাআতের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন, আল্লাহর পথে আমাদের আসীরানে (বন্দী) হওয়ার সৌভাগ্য ইনিই আমাদের দান করেছেন। একটু দুরে তাদের মসজিদ, চলে গেলাম সেখানে, মুয়ায্যিন ও ইমাম সাহেবকে সালাম বললাম। ফিরার পথে শোকর আলী সাহেবের বাড়ীতে গেলাম, কারণ গত রাত্রেই আমি জানতে পারলাম যে তার বার / তের বৎসরের মেয়ে অচল, ঘর থেকে উঠান আর উঠান থেকে ঘর পর্যন্তই গড়াগড়ি দিয়ে চলে। মেয়েটির করুণ অবস্থা দেখে আমার মনটা অস্থির হয়ে পড়লো; তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। এরূপ দুঃখজনক অবস্থায়ও তার মুখে মৃদু হাসি লক্ষ্য করলাম। শৈশবকালে সে স্বাস্থ্যবতী ছিল, স্কুলে লেখাপড়া করতো, সমবয়স্কা বান্ধবীদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধূলা করতো। দশ বৎসর বয়সে সর্বনাশা টাইফয়েড তার জীবনকে করে গেল পঙ্গু। মনে হয় হযরত গৌতম বুদ্ধ আলায়হেস সালাম এইরূপ দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দেখেই প্রাথমিক কালে জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং নির্জনে অস্থির হয়ে চিন্তা করতে থাকলেন যে কীরূপে মানুষকে দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্ত করা যায়। তদ্রূপ অবস্থা অপরাপর সকল নবী রসূলগণের উপরও এসেছিল। অবশেষে তারা আল্লাহ্ কর্তৃক দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির পর পুনরায় মানুষের মধ্যে ফিরে এসে মানুষের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গটি এখানেই রাখি।

১৯ মে ২০০৭ তারিখে ভোর থেকে ইশা পর্যন্ত আমাদের তরবিয়্যতী ক্লাস চলতে থাকে; উপস্থিত ছিল ৮০/৯০ জন। ইশার নামাযের পর সকল কর্মসূচী শেষ করে অধিকাংশ লোক আপন আপন বাড়ী চলে গেল। এই সময়ে পুলিশ ক্যাম্প থেকে সংবাদ আসলো যে আব্দুল মতিন সাহেব, মুনিরুজ্জামান

সাহেব, মুযাম্মেল হক সাহেব এবং যিকরে ইলাহী সাহেব এই চারজনকে ওখানে স্মরণ করা হয়েছে। সুবেদার সাহেবের আদেশানুযায়ী তারা সাড়ে নয়টায় পুলিশ ক্যাম্পে চলে গেলেন। পৌঁছার সাথে সাথেই তাদেরকে গ্রেপ্তারের আওতায় এনে সুবেদার ইউনুস সাহেব নিজ বাসগৃহে বন্দী করে নিলেন; অবশ্য দরজা জানালা খোলাই ছিল; শুধু একজন সিপাহী রাইফেল নিয়ে দরজার বাহিরে পাহারারত থাকলো। এই সব বিষয় আমাদের মধ্যে কেউই জানতে পারে নাই। আমি ভাবলাম যে তারা একটু পরেই চলে আসবে, আমি আমার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম। পনের / বিশ মিনিট পরেই কেউ এসে আমাকে জাগিয়ে বললো, "বাহিরে আসেন"। বাহিরে মসজিদের প্রাঙ্গনে দেখি, পনের / বিশ জন অচেনা মানুষ চেয়ারে সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন। আমাকে জানানো হলো যে,তারা অত্র অঞ্চলের মেম্বার এবং প্রধানগণ; আট দশজন সিপাহী রাইফেল নিয়ে ঘেরাও করে আছে; আমি সকলকে সালাম বললাম, আমাকে মেম্বার সাহেব সামনে একটি চেয়ারে বসতে বললেন। আমি এই অপ্রত্যাশিত উদ্ভূত অবস্থা বুঝতে পারছিলাম না যে, কি ব্যাপার! কেবল দেখতে থাকলাম, মন বলছিল যে, বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। দেখলাম দুই তিন জন সিপাহী মসজিদের ভিতরে আমাদের বই পুস্তক ব্যাগে ভরছে; কিছুক্ষণ পরে দেখি যে দুই জন সিপাহী আমার রুম থেকে আমার ব্যাগ, টর্চ ও এলার্মপীস এবং কিছু কাপড় চোপড় হাতে নিয়ে আসছে; একটু পরে সুবেদার ইউনুস সাহেব আমার সামনে এসে বললেন, "মুরব্বী! আমার বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করবেন না; আমরা কেবল উপরের হুকুম পালন করছি।" আমি উত্তরে বললাম, খোদা তো এরূপ নন যে তিনি এমনি এমনি কারো বদ্‌দোয়া কবুল করে নেন; তিনি অবশ্য স্থান-কাল-ভেদ দেখবেন; কিন্তু আপনারা যদি আমাদের উপর যুলুম করেন তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানাবো।" তিনি বললেন, "না না, আমরা যুলুম করবো না।" তিনি আমার সামনেই চেয়ারে বসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ওয়ায়েরলেসে বললেন, "পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে পূর্বে আমরা গ্রেপ্তার করে ক্যাম্পে আবদ্ধ করেছি; এখন পঞ্চমজন মুরব্বীকেও গ্রেপ্তার করলাম।" এক সিপাহী আমাকে আমার ব্যাগ ইত্যাদি ধরিয়ে দিল এবং বললো আপনার মোবাইল আমাদের কাছে আছে; পরে দিয়ে দেয়া হবে, এখন আপনি আমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে চলুন। আদেশ মোতাবেক রাত্রের অন্ধকারে সিপাহীদের পিছনে পিছনে প্রায় এক মাইল অজানা পথে চলতে থাকলাম। ক্যাম্প প্রশস্ত টিলার উপর অবস্থিত। সুবেদার সাহেবের রুমে আমার চারজন সঙ্গীকে পেলাম হাস্যোজ্জ্বল। রুমে এক জনের একটি খাট একটি চেয়ার ও একটি টেবিল। আমরা পাঁচজনে পালাক্রমে ঐ খাটে ও চেয়ারে শুয়ে বসে রাত কাটালাম। ফজরের নামায আমরা ওদেরই মসজিদে পৃথক ভাবে বাজামাত আদায় করলাম; তারা কেউ কিছু বলে নাই। নাশতা আমরা আশাতীত ভাল খেলাম, গরম ভাত মিষ্টি কুমড়ার তরকারী। সাতটায় ক্যাম্প ছেড়ে পাঁচ মাইল দূরবর্তী আঞ্চলিক আর্মি হেড কোয়ার্টার রাজনগরে যেতে বলা হলো চারজনকে ঘিরে আট জন সিপাহী রাইফেল সহ হেঁটে যাওয়ার আদেশ হলো। আমাকে সুবেদার সাহেব ছোট নৌকায় অর্ধেক পথ নিয়ে গেলেন, আমাদের ভাল ভ্রমণ হলো। অর্ধেক পথে একটি চায়ের দোকানে আমরা সকলে একত্রিত হলাম। আমরাই তাদের সকলকে চা বিস্কুট খাওয়ালাম। আড়াই মাইল হেঁটে চলার সময় সিপাহীরা অনেক অনেক প্রশ্ন করলো; আলহামদুলিল্লাহ্‌, ভাল তবলীগ হলো। অবশেষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর্মি হেড কোয়ার্টার রাজনগরে পৌঁছে গেলাম; নাম অনুযায়ী বাস্তবিকই বড় সুন্দর অঞ্চল; হেড কোয়ার্টারটির রাজকীয় শান ও শওকত প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু পাবলিকের জন্য কোন টেলিফোন বা মোবাইল করার ব্যবস্থা ছিল না (গত মে মাস থেকে হয়েছে)। আল্লাহ্‌রই খাস ফযল যে আমাদেরকে যেখানে বসানো হলো তার কাছেই আর্মির টেলিফোন সেট ছিল। আব্দুল মতিন সাহেব আমাদের মাহিল্লার আয়নুল হক সাহেবকে, যিনি আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য মাহিল্লা থেকে এখানে সময় মত পৌঁছে গিয়েছিলেন, বললেন, দেখেন তো টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কি না। আলহামদুলিল্লাহ্‌। সুযোগ পাওয়া গেল আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডে আব্দুল মতিন সাহেব চট্টগ্রামের আমীর সাহেবকে আমরা যে বন্দী অবস্থায় রাজনগরে

আছি জানালেন, ঢাকা সংবাদ দিতে বললেন। এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন অফিসার লাইন কেটে দিলেন এবং অপারেটরকে কৈফিয়ত তলব করলেন যে পাবলিক টেলিফোন কেন করা হলো। এরপর যেন আর না করা হয়। নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান বৃদ্ধির জন্যই গাইবী সাহায্যের তাজা নিদর্শন আল্লাহ্ আমাদেরকে দেখালেন ।

ডি,এ,ডি,র আদেশক্রমে আমাদেরকে এখানে সম্মানের সাথে রাখা হলো, চা বিস্কুট খাওয়ানো হলো। এই সম্মানের পিছনেও আল্লাহ্রই হাত রয়েছে। বিশ পঁচিশ মিনিট পর ডি,এ,ডি জনাব রিয়াজুদ্দিন সাহেব দশ জন অস্ত্র সুসজ্জিত সেনাদের মধ্যে আমাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য চলে আসলেন, সুবেদার ইউনুস সাহেব আমাদের মধ্য হতে উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন কিন্তু ভুলক্রমে হাত উঠালেন না, এতে ডি, এ,ডি, সাহেব তার উপর ভীষণ রাগ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকলের সমানে কৈফিয়ত তলব করলেন "তুমি স্যালিউট করার সময় হাত উঠাও নাই কেন, তুমি কি আমার র‍্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ না, না দেখতে পারলে চশমা লাগাও, চশমা লাগাও; সুবেদার বললো, স্যার চশমা নাই; এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে সিংহ গর্জনে আরো চিৎকার করে বললেন, চশমা লাগাও; তুমি চাকরি করছো কত বৎসর হলো? তোমার বারটা বাজিয়ে দিব।" সুবেদারের এই লাঞ্ছনা দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের উপর নাযিলকৃত ইলহামটির সত্যতা স্মরণ করছিলাম ঃ

"ইন্নী মুহীনুম মান আরাদা ইহানাতাকা" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার লাঞ্ছনার সংকল্পও করবে, আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো।"

অল্পক্ষণ পরে ডি,এ, ডি, সাহেব আমাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকলেন, সালামের পর তিনি আমাকে সামনের চেয়ারে বসালেন এবং নাম ঠিকানা ও শিক্ষা কি এবং কোথা থেকে লাভ করেছি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করার পর প্রশ্ন করলেন, "আপনারা মাহিল্লা কেন আসলেন? উত্তরে বললাম, আহমদীয়া মুসলিম জমাআত একটি খালিস ধর্মীয় জমাআত, দেশের আইন কানুন মেনে ইসলাম ধর্মের সেবা ও এর প্রচার করে থাকে, কলেমা নামায এবং ইসলামী মাস্‌লা ম্যাসাইল ও কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। মাহিল্লা আমাদের কিছু নূতন আহমদী ভাই হয়েছেন যারা এইসব বিষয়ে অনেক কাঁচা, তাই এসব দ্বীনি তা'লিম দেওয়ার জন্য মাহিল্লায় আমাদের আসার উদ্দেশ্য। মসজিদে উন্মুক্ত পরিবেশে আমাদের ক্লাস হয়, কোন রাজনৈতিক কথাবার্তা হয় না। ডি,এ, ডি, সাহেব বললেন, আপনারা যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন তা হলে আপনারা কি জানেন না যে বর্তমানে দেশ জরুরী অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে; কোন প্রকার ইজতেমা, জলসা, ক্লাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ। আমি বললাম, হ্যাঁ জরুরী অবস্থার প্রথম দিকে নিষিদ্ধ ছিল, পরে তা শিথিল করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক বলা হয়েছে যে সীমিত আকারে ধর্মীয় সভা করা যাবে, কিন্তু তাতে কোন রাজনৈতিক বিষয় থাকবে না। ডি,এ,ডি সাহেব বললেন, "আপনার কাছে এটার প্রমাণ আছে? আমি উত্তরে বললাম, এই মূহূর্তে তো আমার কাছে নাই। পত্র পত্রিকায়, রেডিও টিভিতে এ বিষয়টি বহু বার পড়েছি ও শুনেছি এবং দেশে অহরহ সবস্থানে ধর্মীয় সভা ও ইজতেমা পালিত হচ্ছে। ডি,এ,ডি, সাহেব বললেন, "আপনারা জানেন যে, এটা Hill Tracts; আর Hill Tracts এর জন্য আইন কানুন কিছু ভিন্ন; এখানে থানা থেকে অনুমতি নিয়ে ক্লাস, ইজতেমা, সভা ইত্যাদি পালন করা হয়। আমি বললাম, "আমাদের এ বিষয়ে মোটেই জানা ছিল না অজ্ঞাত সারে এটা হয়েছে; অতএব এটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, ক্ষমা করা মহত্তের লক্ষণ।"

এসব কথার মধ্যেই ডি, এ ডি, সাহেবের টেলিফোন আসলো, তিনি স্যার স্যার বলে বড়ই আদবের সাথে কথা বলছিলেন; এক পর্যায়ে তিনি বললেন, এখানে তাদেরকে সম্মানের সাথে রাখা হয়েছে..... আর এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কেসটা যেহেতু রেজিষ্টারে এবং বিভিন্ন স্থানে রেকর্ড হয়ে গেছে এখন এটা আইন অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকবে। হ্যাঁ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মাঝপথে হস্তক্ষেপ করলে মুক্তির পথ সৃষ্টি হতে পারে। ড়ি,এ,ড়ি, সাহেব শেষে বললেন, "আপনি যা বিবরণ দিলেন রিপোর্টে আমি তাই লিখে দিব; এখন আপনাদের কিসমত। প্রায় দুটায় আমাদের সকলের ইন্টারভিউ শেষ করার পর বড় দুইটি আর্মির গাড়ী আসলো গাড়ীতে উঠার আগে আবারো চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো এবং উপস্থিত সকলেরই গ্রুপ ফটো

তোলা হলো; অতঃপর আমাদের পাঁচজনকে সুবেদারসহ দশজন আর্মড ফোর্সের পাহারায় রাজনগর হতে প্রায় ৬০ মাইল দূর বাঘাইছড়ি থানায় চালান দেয়া হলো; চার মাইল গেলে পরে গাড়ী ছেড়ে একটি ইঞ্জিন চালিত বড়-সড় খোলা নৌকায় বসানো হলো যানবাহনটি ছাড়ার আগে নিকটস্থ বাজার থেকে আমাদের দুই জন ১৫ জনের জন্য পাউরুটি ও কলা নিয়ে আসলো, আমরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেলাম, সেনা ভাইদের সাথে আমাদের হৃদ্যতা জমে উঠলো। আমাদের যানবাহনটি মৃদু গতিতে বিভিন্ন পার্বত্য নদ-নদী ও জনবসতি অতিক্রম করে বাঘাইছড়ি থানার দিকে ধাবিত; আসলে আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনায় ছিল আমাদের এ ভ্রমণ; কত যে আনন্দদায়ক বলার ভাষা আমার কাছে নেই, কারণ আমি কবিও নই, সাহিত্যিকও নই। আমরা পাঁচজন নৌকায় আল্লাহ্‌র দেয়া ফুরসত অনুযায়ী কসর নামায পড়লাম বটে, কিন্তু দোয়া কসর করিনি, দোয়া পূরোই করলাম যে, হে করুণাময় দয়াল সর্বোপরি কাদের খোদা! তুমি আমাদের মত দূর্বলদেরকে কুদরতের নিদর্শন দেখাও; সকলের জন্য আমাদের সকলের দোয়া কবুল কর হে সামিউদ্দোয়া কাবেলুততওবা। প্রায় আসরের সময় আমাদের যানবাহনটি ক্ষণিকের জন্য আমাদের মাহিল্লার ঘাটে আসলো; কি দেখি! মূর্তিমান সেই মহব্বত, আমাদেরই সেই আহমদী ভাইয়েরা আমাদের জন্য আম কাঁঠাল নিয়ে ঘাটপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্যে জনাব আয়নাল হক হাস্যোজ্জ্বল শোকর আলী। আহমদীয়াতের মাটিতে গড়া এইসব ভাইকে আমরা কিরূপে ভুলতে পারি? রাত নয়টায় আমাদের অজানা অচেনা বাঘাইছড়ি থানায় আমাদেরকে রেখে সুবেদার সাহেব সেনা দলসহ চিরবিদায় নিলেন; আল্লাহ্ তাদের সহায় হউন। পরে আব্দুল মতিন সাহেব আমাকে জানালেন যে তিনি তার কর্মকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। বাঘাইছড়ি থানার ও, সি জনাব আব্দুর রায্যাক সাহেব সুপুরুষ ও ভালো মনের মানুষ, তিনি এক কালে ঢাকা লালাবাগ থানায়ও ছিলেন; আহমদীদেরকে ভাল বলেই তিনি জানতেন। থানায় আমাদেরকে একটি বড় রুমে রাখার আদেশ দিলেন। দুইটি মধ্যম সাইজের চৌকী ও বাথরুম সংযুক্ত ছিল। নিয়মানুযায়ী দরজার বাহিরে তালা এবং একজন সিপাহী রাইফেল সহ মোতায়েন ছিল। আমাদেরকে বলা হলো, কোন জিনিষ দরকার হলে সিপাহীকে বলতে, খাবার পানি ইত্যাদি। এখানে আমরা তিন রাত ও আড়াই দিন ছিলাম। রাত দিন ইবাদত ও দোয়ায় কাটতো। আমার ব্যাগে কুরআন ও দুররে সমীন ছিল। আমরা তেলাওয়াত করতাম। আর একে অপরকে নযম শুনাতাম। বিশেষভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের নযমের এই ছন্দটি পড়তাম!

"জো খোদা কা হ্যায় উসে য়াল্ পাকারনা আচ্ছা নাহীঁ!

হাত শেরোঁপে না ডাল আয় রুবাহ্ যারও নেযার!!

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদার, তাকে চ্যালেঞ্জ করা ভাল নয়!

হে জরাগ্রস্ত শীর্ণকায় জীর্ণদেহ! তুমি সিংহের উপর হাত তুলো না।

এস্থলে সিংহ দ্বারা সায়্যেদোনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে, অবশ্য তাঁর দাসরাও ছোট ছোট সিংহই বটে। যেরূপে হুযূর আকদাস আলায়হেস্ সালাম বলেছেন, আগুন আমার দাস এবং দাসগণেরও দাস।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ রাযিয়াল্লাহো আনহোর এই ছন্দটিও

"না মোমকিন্ কো ইয়ে মোমকিন্ মেঁ বদল দেতী হ্যায়!

আয় মেরে ফলসফিয়ো যোরে দোয়া দেখোতো!!

অর্থাৎ দোয়া বস্তুতঃ অসম্ভকে সম্ভবে পরিবর্তন করে ফেলে! হে আমার দার্শনিকগণ দোয়ার শক্তি লক্ষ্য কর!!

২১ মে তারিখ বাঘাইছড়ি থানার ও,সি, আবদুর রায্যাক সাহেব আমার প্রায় এক ঘন্টা ইন্টারভিউ নিলেন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস, জামাতের শৃঙ্খলা ও কর্মকাঠামো ইত্যাদি সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম আপনি আমাকে অনেক সময় দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের বিষয়টি আমার গভীরভাবে জানা দরকার। এর আগে ঐ দিন ভোরে ও,সি, সাহেব নিজে টীম নিয়ে সরেজমিন মাহিল্লা গিয়ে তদন্ত করে আসলেন। আমাদের সকলের ইন্টারভিউ নেওয়ার পর তিনি ৫৪ ধারাতে কোর্টের জন্য রিপোর্ট লিখলেন এবং বিকেলে আমাদেরকে বললেন যে আপনারা আগামী কাল ভোরে রাঙ্গামাটি

কোর্টে হাজির হবেন। রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ি থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূর। প্রথমে নৌকা যোগে নদী পার করার পর সম্পূর্ণ মোটরের পথ।

২২ মে ভোরে নাশতার পূর্বে আমাদেরকে কোর্টে চালান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হলো। নিয়মানুযায়ী কোর্টে যাওয়ার সময় হাতকড়ি পরাতে হয়; তাই আব্দুল মতিন, যিকরে ইলাহী মনীরুয্যামান এবং মুয্যাম্মেমল হক প্রমুখগণকে শুধু বাম হাতেকড়ি পরানো হলো; আমাকে তখন জানি না কি কারণে হাতকড়ি পরানো হলো না অন্যদের হাজত খানা যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাতকড়ি পরানো থাকলো। বাসে বসার আগে হোটেলে সিপাহীদেরকে নিয়ে নাশতা করে নিলাম। হাঁ বাঘাই ছড়িতেও হাজতে থাকাকালে আমরা আমাদের খাবারের ব্যবস্থা থানার মাধ্যমে করেছিলাম, খাবারের কোন কষ্ট হয়নি। রাঙ্গমাটির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পুরুষ মহিলা ছোট বড় সকলেই আমাদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতো, তারা এই ধারণাই করতো যে, এরা ভীষণ অপরাধী, অসামাজিক ঘৃণিত ও গর্হিত লোক। আমাদের তো কিছুই বলার ছিল না, সহ্য করা এবং হাস্যবদন থাকা ছাড়া। আসলেই আমরা অন্তরে এত আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করছিলাম যা বহির্প্রকাশ সাধ্যাতীত। হযরত মসীহ্ পাক আলায়হেস্ সালামের এই অমূল্য শিক্ষা সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় দীনতা প্রকাশ কর ও লাঞ্ছনা বরণ কর, আজ এই শিক্ষার উপর আমল করে সৌভাগ্যের পথে কদম রাখার আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ সুযোগ দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রায় দুই ঘন্টা সফর করে রাঙ্গামাটি কোর্টের সুন্দর অঙ্গনে যে মুহূর্তে আমরা কদম রাখলাম ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঢাকা থেকে পাঠানো টীম জনাব আকরাম চৌধুরী সাহেব, মুতাহার চৌধুরী সাহেব, সাবের হোসেন সাহেব, চট্টগ্রাম থেকে জনাব আযীযুল হক সাহেব, সৈয়দ মুবারক আহমদ মামুন সাহেব প্রমুখ পৌঁছে গেলেন। তারা আকরাম চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে আমাদেরকে স্বাগতম জানালেন, আকরাম সাহেব বড়ই আবেগের সাথে বলতে লাগলেন আপনাদেরকে মুবারকবাদ, শতবার মুবারকবাদ। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছেন। তাদেরকে পেয়ে আমাদের হাত যেন আকাশের নাগাল পেল, কত যে শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দের সন্ধিক্ষণ! হাইয়্যো কাইয়্যোম খোদা! তুমি আজীবন আমাদের অন্তরে এই আনন্দের ও স্বস্তির সন্ধিক্ষণ অম্লান রাখিও। আল্লাহ্র পথে নিরঙ্কুশ ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে এবং কষ্ট, ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করলে এই দুনিয়াতেও কিছুটা জান্নাতের আনন্দ ও সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। হায়! জগদ্বাসী যদি তা উপলব্ধি করতে পারতো! হাঁ আকরাম সাহেবের কথা বলছিলাম, তিনি বাঘাইছড়ির ওসি সাহেবকে তাকিদ করেছিলেন যেন আমাদের প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখেন। আর রাঙ্গামাটি কোর্টে হাজির হওয়ার পর তিনি ও তার টীমের সঙ্গীরা আমাদের হাজতে ও জেলখানায় থাকা কালে সার্বক্ষণিক ভাবে খাওয়া দাওয়া ও ফলফলাদির ব্যবস্থা এমনকি লুঙ্গী গামছা, টুথ পাউডার ও ব্রাশ সাবান ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন। আকরাম সাহেব আমাকে জানালেন যে মাওলানা আব্দুল আউয়াল আমার হাল অবস্থা জানিয়ে আমার খাওয়া দাওয়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার তাগিদ করলেন।

এখন বলছি যে আমরা হাজতে কেমন থাকলাম ঃ

আমাদের ক্ষণিক সময় দেখা সাক্ষাতের পর অফিসে যেতে বলা হলো যেন আমাদের সাথে পরনের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়, টাকা কাগজ কলম মোবাইল ইত্যাদি কিছুই না থাকে, এই জিনিষ আত্মীয়স্বজনের কাছে বা অফিসে জমা দিয়ে দেন। অতঃপর কোর্টে বিচারক মহোদয়ের সম্মুখে অপরাধী হিসেবে হাজির হওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য আমাদেরকে হাজতে ঢুকানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষক ঘোষণা দিল 'পাঁচজন যারা, তারা হাকীমের সামনে পেশ হওয়ার জন্য হাজত হতে বাহিরে আসবে মোটা মোটা রডের দরজা খুললো, বাহির হলে প্রথমে আমাদের চারজনকে হাতে হাতকড়ি পরানো হলো, আমার পালা আসলো, আমি নিজ থেকে বাম হাত আগে বাড়িয়ে দিলাম, জীবনে প্রথমবার হাতে হাতকড়ি পরলাম, আলহামদুলিল্লাহ্। হাতকড়িতে চুমু খেলাম। (আমাকে বলা হলো যে, লোক আমার এরূপ আচরণ দেখে অবাক হলো আর দেখতেই থাকলো যে পূর্বে তো কেহ এরূপ করেনি), মোট কথা, আমাদের পাঁচজনকে বিচারক মহোদয়ের সম্মুখে কাঠগড়ায় হাজির করা হলো। আমাদের

পক্ষের দুজন উকিল ভালভাবে দীলল প্রমাণ উত্থাপন করেছেন যে, থানার রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের আসামীদের অপরাধ অসহনীয় নয়, বিচারক মহোদয় ইচ্ছা করলে জামানত মঞ্জুর করতে পারেন; আমাদের বার এসোসিয়েশনের সকলেই জামিন হতে প্রস্তুত। বিচারক মহোদয় মেজর আকরাম চৌধুরী সাহেবকে কিছু বলতে বললেন, তখন মেজর আকরাম সাহেব ভরা মজলিসে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জমাআত একটি শান্তিপ্রিয় ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধর্মীয় জামাআত, বহুবার জঙ্গী ও উগ্র মৌলবাদীরা আমাদের জামাআতের উপর আক্রমণ করে জানমালের ক্ষতি করেছে, তাই সরকার আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, অতএব এই জমাআত সম্পর্কে দাঙ্গা ফাসাদের চিন্তাও করা যায় না।"

অবশেষে বিচারক রায় শুনালেন যে, জামিন নামঞ্জুর। ৬ জুন তারিখে মামলা শুনানি হবে।"

আমাদেরকে আবার হাজত খানায় রাখা হলো। ঈমানে দৃঢ় ও মজবুতির জন্য আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমাদের আরো কিছু দিন অগ্নি পরীক্ষা দরকার ছিল। হাজতখানাটিতে ১০/১৫ ফুটের একটি মাত্র মোটা রডের দরজা রুমটিতে কোন জানালা ও ভেন্টিলেটর ছিল না। আমরা ১৮ জন আসামী ওটাতে ছিলাম, জায়গার অভাবে গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। ঘন্টা দুয়েক পর রুমটিতে অক্সিজেনের অভাব ও শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে বায়ু দুষিত ও গরম হয়ে উঠল, ফলে আমার ভীষণ উদ্বেগ আরম্ভ হয়ে গেল, এক পর্যায়ে এমন মনে হলো যে, যেকোন মুহূর্তে আমি মেঝেতে ঢলে পড়ে যেতে পারি, এই সময়টি আমার জন্য ভয়ানক এবং আশঙ্কাজনক ছিল; কারণ মেঝেতে পড়ে গেলে আশঙ্কা ছিল দূর্ঘটনার, আমি একটু সাহস করে বাথরুমে চলে গেলাম, বাহিরে এসে শুনি "হাজতিরা এখন বাহিরে চলে আসুন; আপনাদেরকে এখন জেলখানায় যেতে হবে" আমি হাঁপ ছেড়ে সঙ্গীদের সঙ্গে বের হয়ে মুক্ত বাতাসে এলাম; ডিউটিরত সিপাহীদের বললাম, 'আমি অসুস্থ, পানি দেন" একজন তাড়াতাড়ি করে পানির বোতল দিল, পানি খাওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম; আল্লাহ্ পুরস্কার দিন এরূপ মানবসেবকদের।

২২ মে দুপুর ঃ এখন আমরা গাছগাছড়া ও ফুলফলাদির বাগানের ভিতরে অবস্থিত জেলখানায় আসলাম। আমাদের এই জেলখানাটি হাজতখানা হতে অনেকগুণে ভাল। ৮/১৫ ফুটের পাশাপাশি দুইটি রুম, একটি রুমে জনাব যিকরে ইলাহী, মুজাম্মেল হক ও আমি; অপর রুমে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মুনীরুজ্জামান এবং বিলাইছড়ির চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা বুদ্ধিষ্ট। রাতে আমাদেরকে এক-একজনের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের গামলায় ভাত ও মিষ্টি কুমড়ার তরকারি; ভোরে প্রত্যেককে একটি করে মোটা রুটি ও গুড়, দুপুরে দুইটি করে রুটি ও একই গামলাতে গাঢ় মুশুরের ডাল।

২২ মে থেকে ২৪ মে দুপুর পর্যন্ত একই রুটিন মোতাবেক খাবার দেয়া হলো। রুটিগুলি অত্যধিক ভুষিযুক্ত ও আধো ভাজা, ইতিপূর্বে পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশেও রুটি খেয়েছি কিন্তু এমন রুটি কখনো দেখিওনি এবং খাইওনি। আমার সঙ্গীরা একটি রুটি খেয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়তো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অপর রুটিটি খেতো। আমি ভাবতাম যে, আমরা আসীরানে রাহে মাওলা ; এর মর্ম, আমরা আল্লাহ্‌র মেহমান, এখন তিনি যা খাওয়াবেন তা আল্লাহ্‌র মেহমানদারী এবং তাঁর দান মনে করবো। আমি খাওয়ার সময় মসনুন দোয়ার সঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নযমের এই ছন্দটি পড়তাম ঃ

"হো ফয্‌ল তেরা ইয়া রাব্ব্ ইয়া কোই ইব্‌তেলা হো;

রাযী হেঁয় হাম্ উসী ম্যাঁ জিস্ ম্যাঁ তেরী রেযা হো।

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তোমার কোন ফযল ও দান হউক বা কোন পরীক্ষা হউক;

আমরা সকল অবস্থায়ই উহাতে সন্তুষ্ট আছি যাতে তোমার সন্তুষ্টি রয়েছে।

খাওয়ার সময় ভাবতাম যে, আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে সুস্বাদ খাবার খাইয়েছো আজ যদি তুমি বিস্বাদু খাবার খাওয়াও তাহলে কি আমি আমতা আমতা করবো! না না-করবো না, সানন্দে খাবো। এই সময় আমি দিগ্বিজয়ী সম্রাট মাহমুদ ও তার প্রিয় গোলাম আয়াযের কথাও স্মরণ করতাম। একবার সম্রাট মাহমুদ কিছু বিশেষ লোকদের মধ্যে তার প্রিয় গোলাম আয়াযকে নিয়ে দরবার করছিল, কেহ সম্রাটের প্রতি ভালবাসা নিবেদন পূর্বক এক ঢাকী খরবূযা (এক প্রকার লতা ফল, যা মিষ্টিও হয় আর কোনটা তিতাও) পেশ

করলো। সম্রাট পছন্দ করে প্রথমে আয়াযকে একটা খরবুযা খাওয়ার জন্য দিলেন। আয়ায চাকু দিয়ে কেটে কেটে খুব মজা করে খেতে থাকলো; সম্রাট তাকে বললেন, আমাকে একটু দাও তো দেখি সম্রাট খেয়ে দেখে, ভীষণ তিতা; সম্রাট আয়াযকে বললেন, তুমি এত মজা করে খাচ্ছো, অথচ এটা তিতা। আয়ায বললো, বাদশাহ্ সালামত! আমি আজীবন আপনার এই হাত দিয়ে দেয়া বহু মিষ্টি খাবার ফল খেয়েছি, আজকেও এটা আমি মিষ্টি বিশ্বাস করে খেয়ে নিলাম।"–আমিও মজা করে খেয়ে নিতাম। আমি ভাবতাম হে খোদা! আমি তো আয়ায হতেও মন্দতর তবে তোমার নাম নিয়ে তোমার দীনের কাজে বের হয়েছি, এখন তোমার পথে এই জেলখানাও আমার জন্য রাজপ্রাসাদ, আর খাবার যাই আসে তোমারই দান।

২৩ মে তারিখে বিচারক মহোদয় আমাদেরকে দেখার জন্য একজন কর্মচারীকে নিয়ে আমাদের রুমের রডের দরজার সামনে আসলেন আমি তাদেরকেও হাস্যবদনে সালাম করলাম। কেহ দেখা করার জন্য আসলে, হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, রাজ মহলে রাজার হালে আছি। আমরা রাজনগরের রাজদুলাল; আমি সঙ্গীদেরকে মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য বলতাম: আর বলতাম হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন ঃ

"মোবারক ও ধন্য সেই কয়েদী যে দোয়া করতে এবং আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতে নিরাশ হয় না। অবশেষে একদিন মুক্তির শুভ সংবাদ অবশ্য পাবে।"

২৩ মে বিকালে জেলখানার উর্ধ্বতন অফিসার জনাব হারুনুর রশীদ সাহেব তার অফিসে আমাকে ডাকলেন। গেলে পরে তিনি বেশ সম্মানের সাথে তার সামনের চেয়ারে বসালেন এবং শালীন ভাষায় আলাপ করলেন, ৪৫ মিনিট ধরে আলাপ চারিতা করলেন। সাধারণ মুসলমান ও আহমদীদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? ইমাম মাহদীর আগমন ও তার করনীয় কাজ কি ছিল? কতটুকু করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলাপ হলো। আরো আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় ছিল যে, ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহেল খামিস দোয়া করেছেন। মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবও দোয়া করেছেন এবং তাঁর দিকনির্দেশনায় জনাব এ, কে রেজাউল করীম ও জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও আইনগত ও প্রশাসনিক বিভিন্ন সহযোগিতা দান করেছেন, আজ বিশ্বের ভাই বোনেরা দোয়া করলেন। চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক আহমদী বোনেরা রোযাও রেখেছেন। ২৪ মে দুপুর পর্যন্ত যথারীতি দোয়া দরূদ পড়তে থাকলাম এবং আমাদের জেলখানার সঙ্গী বিলাইছড়ীর চেয়ারম্যান জনাব অমর জীবন চাকমা বুদ্ধিষ্টকে ইসলামের সুশিক্ষা বিস্তারিতভাবে পেশ করা হলো, তিনি বললেন, ইতোপূর্বে আমি এইভাবে ইসলামের তবলীগ পাইনি। আপনারা যে ইসলাম পেশ করলেন তা গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। তবে জেল থেকে বের হলে পরে আমি আরো জানার চেষ্টা করবো। আমি আপনাদিগকে আমার অঞ্চলে আমার চাকমাদের মধ্যে এই ইসলাম প্রচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

দুপুর প্রায় দুইটার সময়, বাহিরের ফটক খুলে এক ঘোষক এই ঘোষণা করলো যে, "পাঁচজনের জামিন হয়ে গেছে আপনারা তাড়াতাড়ি অফিসে চলে আসুন"। হযরত মসীহে পাক আলায়হেস্ সালামের মধুর অটল বাণী অতি ত্বরিত পূর্ণ হলো, আলহামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন। উক্ত শুভ সংবাদ শুনা মাত্রই সকলেই হাস্যোজ্জ্বল দেহমন নিয়ে লাফিয়ে উঠলো, আর কিঞ্চিৎ বিলম্বও কি সওয়া যায়!! এন্ট্রি অফিসে কাজ সেরে আমরা আমার যেরে তবলীগ চীফ জেল ইনচার্জ জনাব হারুনুর রশীদ সাহেবের অফিসে গেলাম, সেখানে দেখি জনাব হারুনুর রশীদ সাহেবের পার্শ্বে জনাব আকরাম চৌধুরী ও মুতাহার চৌধুরী সাহেবদ্বয় বসে আলাপ করছেন, আমাদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজর সাহেব আবেগে অভিভূত হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পরে মুতাহার সাহেব হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, অফিসে উপস্থিত সকলেই গুরুগম্ভীর হয়ে গেলেন; মুর্তিমান গম্ভীর জনাব হারুনুর রশীদ সাহেবও আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন, আমি আগে যেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম; শেষ বিদায় মুহূর্তে আমি দস্তুর মোতাবেক সদ্ব্যবহারের জন্য শোকরিয়া আদায় করে বললাম, "আবারো দেখা হবে"। মেজর সাহেব বললেন, 'আপনি কি আবারো জেলে আসতে চান?" সকলেই হাস্যরস উপভোগ করলেন, আমি স্বগোতক্তিতে বললাম আমাদের আঞ্জুমানে দেখা হবে"। অতঃপর

আমরা জেল গেট দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসলাম। অনেক দিন পরে মুক্ত আকাশ ও মুক্ত দুনিয়া দেখলাম, বাহ বাহ! আমার ছোট বুক আনন্দের বিশাল সমুদ্রকে সামাল দিতে পারছিল না, উচ্ছ্বসিত আনন্দ স্রোতে আমরা ভেসে গেলাম জনবসতিতে। হে করুণাময় খোদা! তুমি আমাকে এই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমার স্নেহময়ী মার কোলে, যার সঙ্গে আমার দেখা নেই যুগ যুগ ধরে, যার সুন্দর মুখমন্ডলটি আমি চিনিনা, তুমি চিনিয়ে দাও, ইনি আমার মা, আমি বলতাম, 'এই দেখ মা! কিভাবে চির আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে'!!

পার্শ্বে শায়িত স্নেহময় আব্বী! তোমার কোন কথা আমার স্মরণ নেই। কিন্তু তোমার একটি কথা আমার মনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাচ্ছে, তুমি আমাকে বলেছিলে, আবদুল আযীয! তুমি ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হও। সুবহানাল্লাহ, করুণাময় তোমার আশা পূর্ণ করেছেন, ইসলামের সেবার পথে তোমার এই নগণ্য সন্তান সময় শ্রম ও রক্ত এবং জীবন উৎসর্গ করেছে। অতএব আব্বী আমার, তুমিও দেখ! কিরূপে আজ আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে!! **রাব্বের হাম হুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।**

রেষ্টুরেন্টের খাবারঃ আকরাম সাহেব আমাদের নিয়ে গেলেন রাঙ্গামাটির সর্বাপেক্ষা দামী রেষ্টুরেন্টে; টেবিলে স্বাদের সব খাবার সাজানো হলো। আমার ডান পার্শ্বে মেজর সাহেব, বাম পার্শ্বে আযীযুল হক সাহেব, আযীযুল হক সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জেলের খাবার আর এই খাবারের মধ্যে কেমন প্রভেদ মনে করছেন? আমি বললাম, ঐ খাবারটা ছিল আল্লাহ্‌র মেহমাননেওয়াযী আর এই খাবারটা হলো আপনাদের মেহমান নেওয়াযী, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ – আসমান-জমীনের মধ্যে যতটা প্রভেদ হতে পারে।

২৫ মে নাশতার পর আমরা সকলেই জামাআতের মাইক্রোতে চট্টগ্রাম রওয়ানা হলাম। এখানে মোহতারাম জনাব মাহমুদুল হাসান সিরাজী সাহেব আমীর চট্টগ্রাম আমাদেরকে চট্টগ্রাম জামাআতে নিয়ে সম্মাননা জানালেন, জাযাহুমুল্লাহ। জুমুআর পরে আমার বড় মেয়ের জামাই হাসানের আব্বু আমার প্রিয় বিহাই শাহ সোলায়মান সাহেব আমাদের সকলের জন্য মহব্বতের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করলেন,জাযাহুমুল্লাহ। বেহাইন জানালেন যে তিনি এবং আরো কিছু মহিলা আমাদের জন্য রোযা রেখেছিলেন, আল্লাহ্ রোযা ও মহব্বতকে কবুল করুন তাদের।

সাড়ে তিনটায় আমরা ঢাকামুখী হলাম। রাত প্রায় আটটায় আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে নিরাপদে বকশি বাজার আঞ্জুমানে আহমদীয়া পৌঁছে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন। এখানে আরেক রকম মহব্বতের জোয়ারের অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। দেখলাম, জনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ এবং জনাব আহ্‌মদ তবশীর চৌধুরী সাহেব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর নেতৃত্বে ৬০/৭০ জন আনসার ও খোদ্দাম ফুলের মালা নিয়ে মসজিদের প্রাঙ্গনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান, আরো দেখলাম আমাদের পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন, মূর্তিমান ইলম ও তাক্ওয়া পরায়ণা ফিরিশ্তা সদৃশ মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবাও অসুস্থতা ও দুর্বলতা নিয়েও গাড়িতে বসে এক পার্শ্বে অপেক্ষা করছিলেন। এই যে পরস্পর নিঃস্বার্থ মহব্বত ও লিল্লাহী সম্পর্ক আল্লাহ্‌র খালিস ধর্ম জীবন্ত ইসলামের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে, যার উজ্জ্বল নমুনা ও আদর্শ আমরা প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পাই, পরবর্তীতে তিন শত বৎসর পর্যন্ত তার ঢেউ তথা নমুনা লক্ষ্য করে থাকি; আর এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের জামাআতে নিঃস্বার্থ মহব্বতের নমুনা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। মোট কথা, আঞ্জুমানে পরস্পর দেখা সাক্ষাত ও কুশল বিনিময়ের পর দশজন খোদ্দাম আমাকে আঞ্জুমান থেকে আমার বাসা পর্যন্ত পৌঁছাতে চলে আসলেন; বাসায় আমার স্ত্রী হুসনে আরা খানম, মেয়ে হালীমা সাদেকা (লাকী) ও তার কন্যা সৈয়্যদা সাদিয়া ও সাজদা, আমার সেঝো মেয়ে রশীদা কানেতা ও তার কন্যা সাবাহ্ওতবা, আমার ছোট মেয়ে নুসরাত সাদেকা অধীর ভাবে অপেক্ষমান ছিল। স্ত্রী তার হারানো স্বামীকে, মেয়েরা হারানো বাবাকে পেয়ে আত্মতৃপ্তি পেল, করুণাময় আল্লাহ্‌র অশেষ শোকরগুযারী করলো। এই সব ঘটনা ও দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় যদি না-ও থাকে তবু খোদার খাতার পাতায় অমর হয়ে থাকবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ

খাদেমে দ্বীন আব্দুল আযীয সাদেক

কীর্তিমানের জীবন কথা–

বাংলার গৌরব হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.)

মানবজাতির পরম বন্ধু আল্লাহ্ তাআলা বাঙালিদের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়মালার আগাম সুসংবাদ তাঁর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে জানান। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ঐশীবাণীর সেই অমর ইলহামটি হল– বাংলা সম্বন্ধে প্রথম যে আদেশ জারি করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে (তাজকেরা, পৃঃ ৫৩৯)। ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকারের দিল্লীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারি করা হলে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিদের মনে অনেক কষ্টের কারণ হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর আঘাত আসে। ফলে এ আদেশকে প্রতিহত করতে বঙ্গদেশে আন্দোলন গড়ে উঠে। বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালেই মাতৃভূমি বঙ্গদেশের মাটি মানুষ ও আলো বাতাস এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে আবেগাপ্লুত হয়ে রচনা করেন তাঁর অবিনাশী গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এতে তিনি ব্যক্ত করেছেন বঙ্গদেশের প্রতি তার হৃদয়ের আকুতি। যা আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু আন্দোলনের শুরুতেই বৃটিশ সরকার বাঙালিদের উপর নানা ভাবে স্ত্রীম রোলার চালায়, প্রতিহত করতে বিভিন্ন শাস্তি প্রয়োগ করে। আদেশকে বাস্তবায়নে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়। তখন ১৯০৫ সালে দিল্লীর গভর্ণরের নামে ঢাকায় নির্মিত হয় কার্জন হল, যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা ভবন। চালু করা হয় বঙ্গভঙ্গের কার্যক্রম। অতঃপর বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণর ফুলার নিজ দায়িত্ব হতে হঠাৎ ইস্তফা দিলে বাঙালিদের মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সালে বলেন, এ আদেশ বাঙালিদের এতখানি মনঃকষ্টের কারণ হয়ে ছিল, যেন তাদের গৃহে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা বাংলার বিভক্তিকরণকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। বরং এর বিপরীত ফল এই দাঁড়ায় যে, সরকারের কর্মকর্তারা তাদের আন্দোলনকে পছন্দ করল না। কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে তাদের সম্পর্কে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশেষভাবে লেফটেনেন্ট গভর্ণর ফুলারকে তারা নিজেদের জন্য মৃত্যুর ফেরেশ্তা মনে করল। কিন্তু এরূপ ঘটল যে, ঐ সময় যখন বাঙালিরা নিজেদের শাসকদের হাতে কষ্ট পাচ্ছিল এবং স্যার ফুলারের ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। তখন আমার নিকট উক্ত ইলহাম হল। অর্থাৎ বাংলা সম্বন্ধে প্রথম যে আদেশ জারি করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে। বস্তুতঃ আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়ই প্রকাশ করি (হাকীকাতুল ওহী বঙ্গানুবাদ পৃঃ ২৪৯-২৫০)।

অতঃপর ৬ মে ১৯১০ সালে বৃটিশ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড লন্ডনে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র পঞ্চম জর্জ বৃটিশ সিংহাসনে আরোহন করেন। পরবর্তীতে পঞ্চম জর্জ রাজমাতা রানী মেরী ১৯১১ সালে ভারত সফরে আসেন। তখন দিল্লীতে জাঁকজমকপূর্ণ এক রাজকীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান নওয়াব, রাজা মহারাজা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম জর্জ এ শাহী দরবারে ১১ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীঃ তারিখে অপ্রত্যাশিত ভাবে বঙ্গভঙ্গের আদেশ রহিত করার ফরমান জারি করেন। ফলে বাঙালিদের মনের কষ্ট দূরীভূত হয়। সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফূটিত হয়ে উঠে। কিন্তু এই ইলহামের বছর ১৯০৬ সালেই বঙ্গ মাতার এক সোনার সন্তান যুগ ইমামের আবির্ভাবের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তাঁর দীক্ষা গ্রহনে মনস্তুষ্টি লাভ করেন। ঐশী নেয়ামতের অংশীদার হন। বাংলার মাটি ও মানুষের সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন–বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত নাগেরগাঁও গ্রামের হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.)। তিনি কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণকারী সাহাবীর আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের বাংলার আকাশে উদীয়মান আলোকবর্তিতার এক মহান পুরুষ।

কালজয়ী বাংলার এ কিংবদন্তী তুল্য মানুষটি উনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে অর্থাৎ ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের মাঝে নাগেরগাঁও খাঁ বাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নযম উদ্দিন খাঁ। তিনি ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে মেঝো। বড় ভাই সায়ামুদ্দিন খাঁ, ছোট ভাই নফিজ উদ্দিন খাঁ এবং তাঁর তিন বোন ছিলেন। বড় বোনের বিয়ে হয় একই জেলার পাকুন্দিয়া থানার হোসেনদী গ্রামের মুন্সী বাড়ীতে। তার সন্তান ময়মনসিংহের সেকালের স্বনামধন্য সম্মানিত ব্যক্তি খাঁন বাহাদুর এডভোকেট মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব্। তিনি ময়মনসিংহের গভর্ণমেন্ট প্লিডার ও জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় সম্মানী-জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অনেক দূর প্রসারিত। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর মৃত্যুর পর ময়মনসিংহ পৌরসভা কর্তৃক শহরে তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে 'খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল রোড'। তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ ইসরাইল ছিলেন নামকরা সাবরেজিষ্ট্রার। তিনি নানার বাড়ীতে দালান এবং পানির জন্য কূপ নির্মাণ করেন। যা ঐতিহ্যের স্মৃতি হিসেবে আজও বিদ্যমান আছে। রইছ উদ্দিন খাঁ সাহেবের অপর দুই বোনের বিয়ে হয় কটিয়াদী থানার অন্তর্গত চানপুর গ্রামের গালিব খাঁর বাড়ীতে এবং কুড়ি খাই গ্রামের শাহ বাড়ীতে। তাদেরও এতদঞ্চলে বংশ মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বিস্তৃত এবং উত্তরাধিকারীরা তা ধারণ করে আছেন।

তখন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নাগেরগাঁও মুসলমান খাঁ বাড়ীর উচ্চ বংশ মর্যাদা এবং অর্থবিত্তে প্রতিথযষা ছিল। শিক্ষা ও কৃষ্টিতে তারা ছিলেন প্রগতিশীল। তাঁর পিতা নজম উদ্দিন খা ছিলেন : ধার্মীক, বিদ্যানুরাগী ও সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাদের বিরাট তালুকদারী ছিল। তাই তিনি নিজ ছেলেমেয়েদেরকে বাল্যকালে উত্তম ধর্মীয় তালিম তরবিয়ত প্রদান করেন। ছেলে রইছউদ্দিন খাঁ সাহেবের সম্ভবত: কলকাতায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি উত্তম ফলাফলে বিদ্যাসিঁড়ির ক্রমধারায় জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে তাঁর এন্ট্রেন্স পর্যন্ত লেখাপড়া করার সৌভাগ্য হয়।

সেকালে গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা লাভ বিশেষতঃ মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা বিরল ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আলেম ওলামাদের ফতোয়া ছিল– ইংরেজী শিখলে ঈমান আমল খোয়া যাবে। ফলে মুসলমান ছেলে মেয়েরা স্কুলে লেখা পড়া করতে যেত না। এ অবস্থায় তাঁর শিক্ষা লাভ নাগেরগাঁও-এর মুখকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। উত্তম চরিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী, ধর্মপ্রাণ পান্ডিত্যের মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। সকলেই শ্রদ্ধাবনত হয়। আত্মীয় স্বজন গর্বিত এবং তাঁর মঙ্গল কামনায় খাস দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতো না বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এক গন্ডগ্রাম নাগেরগাঁও-এর রইছ উদ্দিন খাঁ সাহেব একদিন পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চল কাদিয়ানে আবির্ভূত বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সান্নিধ্য লাভে তাঁর হাতে বয়াত করে সাহাবীর মর্যাদা লাভে আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হবেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট, তিনি ব্যতিরেকে তা কেউ জানে না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন' (আল আনআম ঃ ৬০)।

শিক্ষা জীবন সমাপ্তিতে খাঁ সাহেব বৃটিশ সরকারের ডাক বিভাগে চকুরীতে যোগদান করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাচীনতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্থানে চাকুরীর পর তিনি পূর্বের ব্রহ্মদেশ পরবর্তীতে বার্মা বর্তমান মিয়ানমারে বদলী হন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি মিয়ানমারের ইরাবতী নদীর তীরে মাগুই নামক স্থানে এক পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। সেকালে মিয়ানমার পাক ভারত উপমহাদেশের অধীনে এবং বৃটিশ শাসনের অধীস্থ ছিল। ১৯৩৬ সালে পাক ভারত হতে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পবিত্র চিত্তের মানুষ রইছ উদ্দিন সাহেবের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কাজের পর ইবাদতই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। নামায রোযা দোয়া এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনেই তিনি মগ্ন থাকতেন। সূরা ফাতেহার দোয়ার ফযিলতে সিরাতাল মোস্তাকিমের আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে ব্যাকুল ছিলেন তিনি। সমাজের একজন উত্তম পরহেজগার মুত্তাকী মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল বই পড়ার সখ। তিনি বাংলা ইংরেজী উর্দু ও ফারসী ভাষা জানতেন। তাই বিভিন্ন ভাষার ধর্মীয় বই পত্র ও পত্রিকা অধ্যয়ন করতেন। বিশেষত ইসলামী সাহিত্য চর্চায় পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠে গবেষণায় মগ্ন থাকেন। তখন বিরুদ্ধবাদীদের এক উর্দু পত্রিকা পড়ে অবগত হন পাঞ্জাবের কাদিয়ানে এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন। সমাজের আলেম ওলামাদের দৃষ্টিতে তিনি মিথ্যাবাদী। এতে তাঁর পবিত্র মনে সত্যতা যাচাইয়ের অনুপ্রেরণা জন্মে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কাজেই ইসলামের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করা প্রয়োজন। কিন্তু তখন তাঁর এর যাচাইয়ের কোন সূত্র জানা ছিল না।

তাই দোয়া করতে থাকেন। এ একনিষ্ঠ সাধনার ফলশ্রুতিতে তিনি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ করুণায় তাঁর প্রেরিত ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্ধান পান। আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত লাভে রাজটিকা কপালে লাগে। ফুল চন্দন ফুটে উঠে।

তখন মিয়ানমারের মাগুই একদিন জুমুআর নামাযের সময় দুই ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন। তাঁরা কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পয়গাম নিয়ে হাজির। একজন পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর সদস্য। অপরজন ডাক বিভাগের কর্মচারী। তাঁরা জুমুআর নামাযের পর মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে যুগ ইমামের আবির্ভাবের সত্যতার উপর বক্তব্য এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও পুস্তক বিতরণে আসেন। নামাজের পর বক্তব্যের শুরুতেই মুসল্লীরা তাদের উপর চড়াও হয়। মারমুখী হয়ে উঠে। অপমান অপদস্ত করে মসজিদ থেকে বের করে দেন। এটা প্রত্যক্ষ করে রইছ উদ্দিন সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হন। কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হলেও তার বক্তব্য না শুনে লাঞ্ছিত করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া এবং অশুভনীয় আচরণ করা ইসলামের শিক্ষা নয়। হযরত রসূল করীম (সা.) ইসলাম প্রচারে বিধর্মীদের সাথে এমন আচরণের শিক্ষা দেননি। তাই তিনি তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং নিজ বাসায় যেতে আমন্ত্রণ জানান। ফলে খোদার পথে ঘর ছাড়া উত্তম দায়ী ইলাল্লাহ্কারী আশেকে মসীহ্ সাহাবীরা খাঁ সাহেবের বাসায় যান। দীর্ঘক্ষণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতার উপর প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। পবিত্র চিত্তের মানুষ খাঁ সাহেবের নিকট অকাট্য যুক্তির সত্যতা দানা বাঁধে। ঐশী নেয়ামতের স্বাদ পান। তাঁরা চলে যাবার সময় আহমদীয়া জামাআতের 'আসলে মোসাফফা' নামক একটি উর্দূ বই উপহার দেন। দাজ্জালের পরিচয়বাহী এ পুস্তকটি পাঠে তিনি জামাতে আহমদীয়ার সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কাদিয়ান গিয়ে যুগ ইমামের দর্শন লাভে তাঁর হাতে বয়াত করার বাসনা জন্মে। সাথে বড় ভাই সায়ামুদ্দিন খাঁ সাহেবকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। তাই ছুটি নিয়ে নিজ বাড়ী নাগেরগাঁও আসেন। বড় ভাইকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সুসংবাদ জানান এবং তাকে কাদিয়ান যাবার অনুরোধ করেন। বড় ভাইও ঐশী নেয়ামতের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন। ছোট ভাইকে বলেন– বর্তমানে আমার শরীরটা ভাল না। নতুবা আমি কাদিয়ান গিয়ে দাবীকারককে দেখে শুনে তাঁর হাতে বয়াত নিতাম। এবার তুমি যাও। তুমি আবার গেলে আমি তোমার সাথে যাবো এবং বয়াত নিয়ে আসবো (পক্ষিক আহমদী-৩০ জুন, ১৯৩৯)।

তখন ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়। জুন কিংবা জুলাই মাস। কাদিয়ানের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অনেক কষ্টসাধ্য। বাটালা থেকে কাদিয়ান ১৮ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা। যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন পায়ে চলা মেঠো পথ। কিংবা এক্কা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, এবং ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া। আশেকে মসীহ্র সত্যের পথিক খাঁ সাহেব আল্লাহ্র নামে একাই যাত্রা করেন। বাটালা পর্যন্ত ট্রেন। তারপর কাদিয়ান ঘোড়ায় চড়ে যান। পথে কিছু কর্দমাক্ত পানির জায়গা পার হতে তাঁর কাপড় কাঁদা পানিতে ভিজে যায়। এ অবস্থায় তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হন। বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মানব প্রেমিক হুযূর (আ.)-তাঁর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হয়ে সুহৃদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন– আপনার কোথাও আঘাত লাগেনি তো? আল্লাহ্র উম্মতী নবী ইমামুজ্জামানের চেহারা মোবারক দর্শন এবং তাঁর মায়া ভরা কণ্ঠের সহানুভূতিশীল সহমর্মীতার কথা শুনে তিনি অভিভূত হন। আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তাআলার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) ফেরেস্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নিকট হতে নবুওয়াতের ঐশীবাণী প্রাপ্তির কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলেন এবং ঈমান আনেন, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণার দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়েছিল খাঁ সাহেবের মাঝে। ফলে তিনি দেরী না করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তখন তিনি পনর দিন কাদিয়ানে অবস্থান করেন। হুযূর (আ.) এবং তাঁর বড় বড় বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের সান্নিধ্য লাভে নূরের পরশে নূরান্বিত হন। পবিত্র কুরআন হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে একজন আদর্শ তবলীগ সৈনিকে পরিণত হয়ে যান। আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি লাভ করেন। অতঃপর নিজ বাড়ি এসে স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় কর্মস্থলে চলে যান।

হযরত রইছউদ্দীন সাহেবের সহধর্মিনী সৈয়দা আজিজুন্নেসা খাতুন সাহেবা ছিলেন একজন পরহেজগার মহিলা। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার তাতারকান্দী গ্রামের সৈয়দ বংশের সন্তান। সে সুবাদেই দুই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মধ্যে প্রণয় হয়। দাম্পত্য জীবনে তাঁরা ছিলেন একে অপরের সহমর্মী, সুখে দুঃখে অতি আপনজন। তিনি অধিকাংশ সময় স্বামীর সাথে তাঁর কর্মস্থলে বসবাস করেন। এ ধর্মপরায়ণ মহিলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন এবং স্বামীর বয়আত গ্রহণের এক বছর

পর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের ৮ মাস পূর্বে ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে হযরত (আ.)-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে বয়াত করেন। তিনি প্রথম ও একমাত্র বাঙালি সাহাবী-য়াগণের গৌরবোজ্জ্বল তারকা হিসেবে চিহ্নিত। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বর্ণাঢ্য স্বার্থক ও সফল মানুষ।

কর্মস্থলে হযরত খাঁ সাহেব সৈনিক বিভাগ এবং ডাক বিভাগের আহমদী লোকদের নিয়ে জামাআতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনজনে মিলে সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্নমুখী কাজে জড়িত হন। বাজামাত নামায পড়া এবং আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে ব্রত হন। ইরাবতী নদীর তীর অঞ্চলে অনেক তবলীগ করেন। রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব পালনের পর যুগ ইমাম আবির্ভাবের শুভসংবাদ অকপটে প্রচার ছিল তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইরাবতী নদীর তীরে সতীর্থদের নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন এবং দুই বার ঈদের নামায আদায় করেছেন। পরবর্তীতে খাঁ সাহেব মাগুই থেকে কাতার নামক স্থানে বদলী হন। সেখানেও তিনি দায়ী ইলাল্লাহ্‌র কাজে ফানাফিল্লাহ্ ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় একজন আহলে হাদীসের মাওলানা জামাআতে আহমদীয়ায় দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি পূর্বে মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতশ্বরীর মুরিদান ছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১৩১৭ সালে হযরত খাঁ সাহেবের বড় ভাই সায়ামুদ্দিন খাঁ পরলোক গমন করেন। ফলে সন্তান হারা মা পাগল প্রায় হয়ে যায়। মেঝো ছেলে রইছ উদ্দিনকে কাছে পেতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই মায়ের একান্ত বাধ্যগত অতি স্নেহস্পর্শের শিক্ষিত সন্তান খাঁ সাহেব ১৩১৯ বঙ্গাব্দ বৈশাখ মাস খৃষ্টাব্দ ১৯১২ সালের এপ্রিল-মে মাসে এক বছরের ছুটি নিয়ে মাতৃকুলে চলে আসেন। তখন তিনি মাতৃসেবা এবং আহমদীয়াতের প্রচারের কাজে ব্রত হন। ছুটি শেষে কর্মস্থলে চলে যাবার জন্য মায়ের অনুমতির আরজ করলে মা তাকে বারণ করেন। মাতৃভক্তিপূর্ণ সন্তান উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–

তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাকিদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের উভয়কেই তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও মমতাপূর্ণ কথা বলবে। তুমি মমতার সাথে তাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখবে এবং বলবে 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেই ভাবে রহম করো, যেভাবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন (আমার) ছোট বেলায়' (বনী ইসরাঈল ঃ ২৪ঃ২৫)।

হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা এক সাহ-াবী (রা.) হযরত রসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাবার হকদার কে? হুযূর (সা.) উত্তরে বলেন, তোমার মা! তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর? হযরত (সা.) উত্তর দিলেন তোমার মা! তৃতীয়বার বললেন, তোমার মা। চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করাতে হুযূর (সা.) বলেন, তোমার বাবা (বুখারী কিতাবুল আদাব)। তাই সাহাবীর জন্মদাতা তাক্ওয়াপরায়ণ আদর্শ মায়ের শিরোধার্য আদেশ পালনে খাঁ সাহেব সরকারী চাকুরী ছেড়ে দেন। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণেই তাঁর চাকুরী জীবনের সমাপ্তি হয়। তিনি বৃদ্ধ মায়ের সেবা শুশ্রূতার জন্য বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা এবং বঙ্গদেশের পথহারা বাঙালিদের পথের দিশায় তবলীগের উদ্দেশ্যে নাগেরগাঁও থাকার ব্যবস্থা করেন।

বাংলার রইছ-রইছউদ্দিন খাঁ সাহেব যখন আহমদী হন তখন বঙ্গদেশে আহমদীর সংখ্যা অতি বিরল ছিল। প্রথম বাঙালি আহমদী সাহাবী চট্টগ্রাম আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামের হযরত আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ (রা.)। তিনি ১৯০৫ সালে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৯১০ কিংবা ১৯১১ সালে মারা যান, দ্বিতীয় বাঙালি আহমদী হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.)। তৃতীয়জন তাঁর সহধর্মিনী। চতুর্থ বাঙালি আহমদী মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল খালেক সাহেব। মুর্শিদাবাদ ভরতপুর জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হাফেজ তৈয়বুল্লাহ্ সাহেবের মামা। তিনি ১৯০৮ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে দীক্ষা নেন। পঞ্চম বাঙালি আহমদী বগুড়ার খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী। তিনি ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের (রা.) হাতে বয়াত করেন। অতঃপর ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তিনজন সঙ্গীসহ কাদিয়ান যান এবং ১লা নভেম্বর ১৯১২ সালে হুযূর আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়াত নিয়ে আসেন। ১৯১৩ সালে হযরত ডঃ মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.) উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া' গঠিত হয়। তখন হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রা.) সহ যে ক'জন বাঙালি আশেকে মসীহ্ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন তাঁরা এ জামাআতের সদস্য হন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হন প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। ১৯১৬ সালে এমারত প্রতিষ্ঠায় মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর নিযুক্ত হন। (চলবে)

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সোজা পথ ও উল্টো জগত

(৩য় কিস্তি)

সোজা পথ ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "(উপরোক্ত দানসমূহ) ঐ অভাবীদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্র পথে (অন্যান্য কাজ থেকে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করতে পারে না। (তারা সাহায্য) চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চেহারার লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে, তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে কিছু চায় না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় তা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৪ আয়াত)।

"এ আয়াত ঘটনাক্রমে ঐসব আত্ম-সম্মানী ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছে যারা অন্যের কাছে হাত পাতে না। এতে ভিক্ষা-বৃত্তির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। 'তা আফ্ফুফ' (দুষণীয় ও অন্যায় বস্তু থেকে বিরত থাকা) ও 'ইলাহাফ' (অতিরিক্ত মিনতি) শব্দদ্বয় ব্যবহার দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ পায়। মহানবী (সা.) ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন (কুরআন মজিদ টীকা ৩৪৮)।

হাদীস ঃ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) একবার বদান্যতা বা ভিক্ষা বৃত্তি থেকে নিবৃত থাকা প্রসঙ্গে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন, উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম; উপরের হাত দাতার হাত এবং নীচের হাত ভিক্ষুকের। (বুখারী মুসলিম)

হাদীস ঃ হযরত সুমারা ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, ভিক্ষা বৃত্তি একটি ক্ষত যা একজন তার মুখমন্ডলে সৃষ্টি করে। এখন যে চায় আপন মুখমন্ডলকে অক্ষত রাখতে পারে আর যে চায় তাকে ক্ষত করতে পারে। কিন্তু কারো পক্ষে দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারীর কাছে চাওয়া (যার কাছে জনসাধারণের প্রাপ্য রয়েছে) অথবা যার চাওয়া ব্যতীত কোন গত্যান্তর নেই তার পক্ষে চাওয়া এমন নয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী নেসাই)

ভিক্ষা বৃত্তি ঃ হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, নীচের হাতের তুলনায় উপরের হাত উত্তম। অর্থাৎ দানকারী হল উপরের হাত ও দান গ্রহণকারী হল নীচের হাত। একদিন হুযূর (সা.)-এর কাছে এক ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য আসলে হুযূর (সা.) বলেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? ভিক্ষুক বললো, হুযূর আমার ঘরে শুধু একটি কম্বল আছে, হুযূর (সা.) বললেন, কম্বলটি নিয়ে এসো, ভিক্ষুক কম্বলটি নিয়ে আসলে হুযূর (সা.) নিজ হাতে কম্বলটি বিক্রি করে কিছু টাকা দিলেন খাদ্য কিনে খেতে, বাকী টাকা দিয়ে একটি কুড়াল কিনে দিলেন ও বললেন তুমি এই কুড়াল দিয়ে বন থেকে জ্বালানি কেটে বাজারে বিক্রয় করে খাদ্য কিনে খাও। সে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ মত কাজ করে ফলে সে কিছু দিন পর উত্তম পোষাক পড়ে হুযূর (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও বলেন, হুযূর! আমি এখন ভাল আছি ও খুব স্বাচ্ছন্দ্যে চলছি। কবির ছন্দে কথাটি এমন **"নবীর শিক্ষা করনা ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।"** ভিক্ষা কত জঘন্য সাধারণ একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রমাণিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি বড় একটি জুব্বা পরিহিত ও মাথায় সুন্দর পাগড়ী, বড় দাঁড়ি, হাতে তছবীর ছড়া অর্থাৎ বড় ধরনের বুজুর্গ আপনার বাড়ী আসেন, তখন আপনি তাকে অবশ্যই স্বশ্রদ্ধ আবেগ নিয়ে সালাম বাদ আপনার দুই হাত বাড়িয়ে মোছাফাহ করে উত্তম আসনে বসার জন্য আবেদন করবেন। তিনি বসেই যদি আপনাকে বলেন, আমি এসেছি আপনার কাছে কিছু সাহায্য নিতে, যেই মাত্র আপনার কাছে সাহায্য চাইলেন, তখনই কিন্তু আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি তুঙ্গে উঠে ঘৃনা প্রকাশ পাবে, তা আপনার দোষ নয়, মহান সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ্র সৃষ্টির নিয়ম যে কোন মন্দ কাজ দেখলেই মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

উল্টো জগত ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বর্তমানে ধর্ম যাজকগণ মাদ্রাসা পড়ার দোহাই দিয়ে ছোট ছোট ছেলেদেরকে নিয়ে প্রতি বাড়ী বাড়ী ও মহল্লায় বা বাসায় বাসায় ভিক্ষা নিজেও করেন এবং কমোলমতি ছেলেদেরও ভিক্ষা বৃত্তি শিক্ষা দিচ্ছেন, এমন কি রাস্তার পাশে মাইক দিয়ে ভিক্ষা ব্যবসায় মেতে উঠতে সচরাচর দেখা যায়, এই ভিক্ষার কোন প্রতিবাদ নেই। আফসোস! ইসলামের এই অধঃপতনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত রসূল (সা.) যে ভিক্ষাকে বার বার নিষেধ করেছেন, এই ভিক্ষাবৃত্তি প্রকাশ্যে প্রচলনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ব্যপৃত। বর্তমানে তথাকথিত নামধারী আলেমগণ দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা কি উল্টো জগত নয়?

আমার জীবনের একদিনের ঘটনা না লিখে পারছি না। ঘটনাটি এমন, আমি এক দিন নিজ বাড়ীর বাংলা ঘরের সামনে বাগানে কাজ করছিলাম এমন সময় তিন জন মৌলবী সাহেব আমার

কাছে এসে সালাম বাদ কশলাদী বিনিময় করলেন, আমি বুযুর্গ ব্যক্তিদ্বয়ের সম্মানার্থে কাজ ফেলে বারান্দায় বসার ব্যবস্থা করি ও আমার মেয়েকে ডাক দিয়ে আস্তে করে বলে দেই চা নাস্তার ব্যবস্থা করতে, পরে আমিও তাঁদের সাথে বসলাম ও জিজ্ঞাসা করলাম কি মনে করে মহোদয়দের আগমন। উত্তরে প্রধান মৌলভী সাহেব বলেন, আমরা তিনজনই টিচার, সপ্তাহে দুইদিন আমাদের এই ডিউটি। মনে মনে রেগে গেলাম, যদিও প্রকাশ করি নাই, কারণ একদিন এই মৌলবী সাহেবই ইংরেজী পাড়াকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন "যারা ইংরেজী পড়বে তারা কাফের।" ইংরেজী পড়াকে হারাম বলে মুসলমান জাতির মাথায় কুঠারাঘাত করে জাতিকে শত বৎসরের অতল তলে তলিয়ে ফেলেছে, তারাই আজ বলে ভিক্ষাকে কালেকশন, শিক্ষাকে বলে টিচার, কর্মকে বলে ডিউটি। দুঃখ হয়, আমি অতি বিনয়ের স্বরে বলছি, সাহেবান! আপনাদের আগমনে বড়ই খুশি হয়েছি, বেয়াদবী মাফ করে কিছু কথা শুনলে বড়ই উপকৃত হতাম। প্রধানজন বললেন, বলুন। প্রশ্নঃ শ্রদ্ধেয়! আপনারা যে ওয়াজ করেন তাতে কি মিথ্যা কথা বলেন? (তিনি মৌঃ সাহেব) বল্লেন না তো! আমি বললাম কিছু দিন পূর্বে ঐ বাজার সংলগ্ন মসজিদের সামনে বড় একটি ওয়াজ মাহফিল হচ্ছিল, উক্ত সভায় মৌলবী সাহেব বলছিলেন বন্ধুগণ! কিয়ামতের দিন যখন ইস্রাফিল ফেরেস্তা সিঙ্গায় ফুক দিবে তখন পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু এই যে মসজিদ এটা সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন মহান আল্লাহ্ তাআলা মসজদিকে জিজ্ঞাসা করবেন, হে মসজিদ সব ধ্বংস হল তুমি ধ্বংস হলে না? সে দিন আল্লাহ্রই হুকুমে মসজিদের জবান খুলবে, মসজিদ বলবে হে আল্লাহ্ আমাকে যারা তৈরী করেছেন ও আমার মধ্যে যারা সামান্য শরীক ছিলেন তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেস্তে নেওয়ার অঙ্গীকার না কর ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ধ্বংস হবো না। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন হে মসজিদ! যারা এতে সামান্য অংশ ও শামিল হয়েছে তাদেরকে বেহেস্তে নিব। এই বলে মৌলবী সাহেব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, বন্ধুগণ! কে আছেন বেহেস্তে যাওয়ার ইচ্ছুক, আপনারা এই মসজিদে শরীক হউন। আমি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম, মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়ে ১টি টাকা মাত্র মৌলবী সাহেবের হাতে তুলে দেই ও মনে মনে ভাবছি যে বড়ই উত্তম একটি কাজ করলাম, হযরত মুহাম্মদ রসূলূল্লাহ্ (সা.) এর স্থলাভিষিক্তদের সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে মৌলবী সাহেবের সামনে পবিত্র কুরআনও মওজুদ আছে, এমতাবস্থায় তিনি যা বলছেন এতে বিশ্বাস না করা ও এই সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামী বা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি মাত্র টাকা মৌঃ সাহেবের হাতে দিতে পেরে মন আমার আনন্দে বিভোর হয়ে ভাবছি যাক বেহেস্তে যাওয়া নিশ্চিত হল। এ ভেবে উল্লাসে বাড়ী ফিরছি এমন সময় সাক্ষাৎ হলো আমার বাল্য বন্ধু শ্রী কুমুদ বাবু মহাশয় এর সাথে তাঁকে বললাম দাদা! আপনি কি বেহেস্তে বা স্বর্গে যেতে চান বা যাবেন? তিনি স্বহাস্যে বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই, তখন আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনি গিয়ে ঐযে ওয়াজ করছেন মৌঃ সাহেব তাঁর কাছে কিছু টাকা দিয়ে আসেন, আমার কথা শুনে তিনিও কিছু টাকা দিয়ে আসেন। আমাদের দুই জনের কথা শুনে কয়েকজন সুইফার ও জুতা সেলাইকারী মুচী তারাও কিছু টাকা মসজিদে দান করে গেলেন ও অংশীদার হলেন। এরপর থেকে আমার মন এত খুশী যে নামায রোযা ও ভাল কাজ করতে ইচ্ছা হয় না বা করি না। এখন আপনারা বুযুর্গানে দ্বীন এসেছেন আমারও মনে খুব খাহেশ যেন কিছু টাকা দিয়ে আপনাদের মন খুশী করি আর নেকীও কিছু হাসেল করি, কিন্তু আমার মনে বড় ভয় হয়, যে কারণে নামায, রোযা ও উত্তম কাজ থেকে দুরে থাকছি, উপস্থিত মৌঃ সাহেবদের মধ্য থেকে একজন বললেন, ভয় কিসের? আমি বললাম, ভাইগণ! এখন যদি কিছু টাকা মাদ্রাসার জন্য দেই তবে অবশ্যই আল্লাহ্ বলবেন হে দুর্বল ঈমানদার! তুমি কি সেই মৌঃ সাহেবের কথা বিশ্বাস কর নাই? যে বলেছিলো ঐ মসজিদ বেহেস্তে না নিয়ে সে ধ্বংস হবে না? তুমি আবার কোন কারণে মাদ্রাসায় টাকা দিলে! তোমার ঈমান এত দুর্বল কেন? ওদের মধ্য থেকে একজন বল্লেন, আপনি এত বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছিলেন? আমি বললাম কি বলেন? মৌঃ সাহেব! যেখানে আল্লাহকে সামনে রেখে মৌঃ ওয়াজ করলেন এতে বিশ্বাসে কমতি রাখি কিভাবে? তিনজনের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বললেন, সাহেব, আজ আপনার কাছ থেকে কিছুই নিচ্ছি না, মাদ্রাসায় গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে আলাপ করে উত্তর নিয়ে এসেই কিছু নিব। এখন পর্যন্ত তাদের আগমন আর হয় নাই। এমন আজগুবি কথা বলে নেক কাজ বন্ধ করা কি উল্টো পথ নয়?

সোজা পথ ঃ পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ "এবং শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসলো সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা রসূলের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা হেদায়াত প্রাপ্ত। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২১-২২)

মহান আল্লাহ্র বাণী ধর্ম প্রচারে ও ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে যেন কোন অর্থ নেওয়া না হয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই ধর্ম প্রচার করে বা ধর্মীয় কাজের বদলা কোন বিনিময় নেন নাই।

উল্টো জগত ঃ বর্তমান সমাজে ইসলাম সজীব রাখতে সভা মাহফীল ও ধর্মীয় উপদেশ ওয়াজ করা হয়, আরও একটু গভীরে মনোনিবেশ করলে দেখা যায়

প্রায় প্রতিটি মসজিদেই বেতনধারী মৌঃ সাহেবানদেরকে ইমাম রাখা হয়। নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর সমানভাবে ফরয, ধনী গরীব, আলেম- মুর্খ, সাদা-কালো, লম্বা-বেঁটে কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই, অর্থাৎ মুসলমান মাত্রই নামায ফরজ। আমার প্রশ্ন বেতনধারী মৌঃ সাহেব যিনি ইমাম নিযুক্ত হলেন, তিনি ইমাম হিসেবে যে নামায পড়ালেন এটাতো তার চাকুরী, তবে নিজের নামায কখন পড়েন? অনেক লোক আছে যারা ঠেলা গাড়ী ঠেলে, রিক্সা চালায়, দিন মজুর, দুস্থ-মিছকীন ওরা তাদের পেশার মধ্য দিয়েই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পন্ন করে থাকেন। ওরা যেমন মসুলমান নামাযী এর মধ্যে যিনি ইমাম সেও এ রকমই মুসলমান। যদি ইসলামে এমন নিয়ম থাকতো যে মুসলমানগণ জামাত নামায পড়লে হিন্দু বা খৃষ্টান অথবা অন্য ধর্মের লোকজন ইমাম হতে হবে তাহলে না হয় ওরা বলতে পারতো যে আমরা টাকা ছাড়া নামায পড়তে যাব না যিনি ইমাম সেও মুসলমান তার উপরও নামায ফরজ তাহলে কেন ওকে টাকা দিতে হবে? বা কেনই তিনি টাকা নিবেন? বরঞ্চ টাকার বিনিময়ে যারা কাজ করেন ওরা তো জনসাধারণের অধীনে চাকরবৎ। অধীনস্থদের পিছনে মনিবের একতেদা করা কতটুকু যায়েজ তা বিবেকবানদের কাছে বিবেচনার দায়িত্ব রইল। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ আছে **ইমামুকুম মিনকুম,** অর্থাৎ তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই। নামায মু'মিনদের মেরাজ, নামায বেহেস্তের চাবী, নামায মু'মিন ও কাফেরদের পার্থক্যকারী। এইসব উপদেশ সমূহ একমাত্র মৌঃ সাহেবগণই পবিত্র কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক জনসাধারণকে বুঝিয়ে থাকেন। তাই তাদের কথায় বিশ্বাস করেই তাদের মধ্য থেকে একজন ডাকেন হাইয়্যা আলাছ ছালাহ্ অর্থাৎ নামাযে জলদি আস। এই ডাকেই আমরা আমাদের সাংসারিক যাবতীয় কাজ ফেলে দৌড়ে যাই ও ইমাম সাহেব যখন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে তাহ্রীম বাঁধে পিছনে আমরা সবাই ইমাম সাহেবের অনুকরণে এটাই করি। রুকু সেজদা ইত্যাদি তাঁরই সংকেতে উপস্থিত বাহ্যিক আদেশে করে থাকি, বা করা হয়। সাধারণ বিচারে প্রতিটি বিবেকের রায় এটাই হতে বাধ্য যে আদেশ করে থাকেন যিনি বা যারা তারই যার আদেশ করা হল তার কাছে পাওনা দার বা পাওয়ার হকদার, ইমাম সাহেব যদি দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকেন বাধ্য হয়ে সবাই দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকতে হবে। এমতাবস্থায় যদি টাকা পয়সা আদান প্রদানের নিয়ম করে নেওয়া হয় তাহলে ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীদেরকে কম পক্ষে কিছু দিয়ে তাদের মন খুশী করা উচিত ছিল, এইরূপে যে ভায়েরা আমার এতক্ষণ আমার কথায় উঠা বসা করেছেন তাই অল্প সল্প কিছু দিয়ে মুক্তি নিচ্ছি, তা না করে তারই কথায় উটা বসা করেছি এবং তাকেই আবার টাকা দিতে হয়। এটা কি উল্টো জগত নয়? তাকে হ্যাঁ অবশ্যই টাকা দিতে বাধ্য থাকতাম যদি হযরত রসূল করীম (সা.) নিজে নিতেন বা এমন নিয়ম করে যেতেন।

পবিত্র কুরআন বলে ঃ "হে রসূল (সা.) তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তা (লোকদের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও, এবং যদি তুমি এমন না কর তা হলে তুমি তার পয়গাম আদৌ পৌছালে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা মায়েদা আয়াত ঃ ৬৮)

আল কুরআন ঃ "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। (সূরা হামীম আস্ সাজদা ঃ আয়াত ঃ ৩৪)।

আল হাদীস ঃ হযরত রসূল করীম (সা.) সর্বাবস্থায় মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতেন, যারা এই রসূল (সা.)-এর আহ্বানে সারা দিতেন ও কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্র রসূল। এই কলেমা মুখে বলেন ও অন্তরে বিশ্বাস করেন তারাই মুসলমান। এইসব মুসলমানই বিধর্মীদের কাছে এই সত্য প্রচার বা কলেমার দাওয়াত দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও এই প্রচারের নিমিত্ত অনেকই জীবন বিসর্জন দিয়ে নিজেদের জীবনকে শহীদী দরওয়াজায় স্বার্থক করেন। পবিত্র কুরআন বলে সৎ কাজে প্রতিযোগিতা কর। অনেক দিন আগের একটি কাহিনী স্মরণে আসায় লিখতে বাধ্য হলাম। বাদ যোহর ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছিলাম এমন সময় ৪/৫ জন লোক আমার সামনে এসে সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রধান জন আমাকে বলিছেন আমরা এসেছি কলেমার দাওয়াত নিয়ে, দয়া করে আপনি আজ আপনাদের মসজিদে মাগরিব নামায পড়বেন অথবা বাদ মাগরিব মসজিদে যাবেন ওখানে দ্বীনের কথাবার্তা হবে, তাই আপনাকে কলেমার দাওয়াত দিচ্ছি। আমি অতি বিনম্র ভাবে এদের বসার আবেদন করলে তারা সবাই ঘরে গিয়ে বসলেন। আমি বিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? তাদের প্রধান জন বললেন, আমরা তবলীগ জামাতের লোক, কলেমার দাওয়াত দিতে এসেছি, আমি বললাম, আপনার ডান পাশের লোকটিকে বরেন তিনি হতবাক! আপনার বাম পাশের লোকটিকেও বলেন এবং অন্যান্য যারা তাঁর সাথে এসেছিল ওদেরকে দেখায়ে বলছি সকলকেই বলেন। তিনি একটু নারাজির মনোভাব নিয়ে বল্লেন আপনি কি পাগল! আমি বল্লাম কেন? তিনি বল্লেন ওরা তো আমার সাথেই এসেছেন, আমি বল্লাম তবুও বলেন। তিনি বললেন, এই জন্যই

তো আপনাকে পাগল বলছি, আমি একটু জোরের সাথে বল্লাম সাবধান! পাগল আমি না আপনি? আপনার সাথে এসেছে ওকে বলতে যদি বাধা থাকে তবে আমাকে আপনি কি মনে কলেমার দাওয়াত দিতে এসেছেন? আমি মুসলমান নই? আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? প্রথম বলেছেন আপনি তবলীগ জামাতের লোক, তবলীগ অর্থ কি? এটা কোন ভাষা? তবলিগ শব্দের মাজদার কি? আপনি কি তবলিগ করেন তাহলে উত্তম কথা জেনে রাখুন, তবলীগ শব্দের মাজদার বা ধাতু বালাগুন, এর অর্থ তুমি পৌছাও যা জান, যে না জানে তাকে। আপনি যদি কলেমার দাওয়াত দেন তবে চলুন আমাদের ইউপি মেম্বার জীবন কর্ত্তা মহাশয়ের ও কবিরাজ দ্বিলীপ ঠাকুর ও মনোরঞ্জন দাস মহাশয়ের কাছে এবং তাদের ধর্ম পুস্তক মহাভারত, গীতাঞ্জলী, মানা সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বার্তা রেফারেন্স দিয়ে সত্য প্রচারে ব্রতী হউন। হযরত মহারাজা শ্রীকৃষ্ণের (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথা সময়েই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ও তাঁকে মানার প্রয়োজনিয়তা তাঁদেরকে বুঝান। আপনার সঙ্গী সাথীদেরকে যেমন কলেমার দাওয়াত দেওয়া অবাস্তব, পাগলামী অনুরূপ মুসলমানকে কলেমার দাওয়াত দেওয়া একটি পাগলামী বই কিছুই নয়। পাঠক বৃন্দ! এটা কি উল্টো জগত নয়?

এই সব বিষয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় এক ভাটী বয়সের এক লোক এসে ঘরে ঢুকলেন ও সালাম বাদ জিজ্ঞাসা করেন এই বাড়ীর মালিক কে? আগন্তকদের মধ্য থেকে একজন আমাকে দেখিয়ে বল্লেন তিনি, আমি বললাম বাবাজী! কি মনে করে বাড়ীর মালিক খোজেন? লোকটি বলছেন, আমি একটি মসজিদের কালেকশন করি, মসজিদটির কাজ প্রায় শেষের দিকে, শুধু ছাদের কাজটি বাকী আছে। তিনি মসজিদের চান্দা চাওয়াতে আমার হঠাৎ করে প্রবীণ আহমদী মোয়াল্লেম মরহুম ইয়াকুব আলী ফকির সাহেবের এক কাহিনী স্মরণ হল আমিও রহস্যের কাহিনীর হুবহু পুনরাবৃত্তির মনস্ত করলাম। আমি বললাম; জনাব এই যুগে সকলে নিজের বাড়ী-ঘর মজবুত ও সুন্দর করার জন্য কত রকমের চেষ্টা ও পরিশ্রম করে নিজ ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ উপায়ে নিজের জীবন বাজি রেখে নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে আর আপনি নিজের বাড়ীঘর ও সহায় সম্পদের নেশা বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ঘর মজবুত ও সুন্দর করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন ভর মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে জীবনটুকু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিচ্ছেন, জানিনা এর বিনিময়ে মহান দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কি পুরস্কারে ভূষিত করেন? আপনার এই মহৎ কাজের জন্য আপনাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ। আপনার এই হাড় ভাঙ্গা খাটুনির প্রতি লক্ষ্য করে আমার মন বড়ই বিগলিত হয়েছে এই মসজিদটির তৈরীর কাজে অন্ততঃ কিছু না কিছু শরীক হই।

জনাব ঃ আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, মনে কোন কষ্ট নিবেন না। আমি জানতে চাই যে মসজিদের জন্য মুসল্লী না মুসল্লীর জন্য মসজিদ? অর্থাৎ মসজিদ কি মুসল্লী খুঁজবে না মুসল্লীগণ মসজিদ খুঁজবে? উপস্থিত যারা ছিলেন সমস্বরে উত্তর দিলেন, মুসল্লীগণ মসজিদ খুঁজবে? তবে তাই যদি হয় তাহলে মসজিদ থাকা ভাল না মুসল্লী থাকা ভাল, তৎসংগে বলছি যে মসজিদ পাকা হলে কি হবে যদি মুসল্লী না থাকে আর যদি মুসল্লী পাকা হয় তবে তো গাছের নীচেও নামায পড়া যায়। যেমন প্রাক ইসলামী যুগে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ দিয়েও খেজুর গাছের নীচে নামায আদায় করেছেন। তবে যাই হোক এত কষ্ট করে এসেছেন আপনার নেকের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ সামান্য ২/৩টি ইট দিয়েও যদি এই মসজিদে শামিল হতে পারি তথাপি আমার জীবন ধন্য হবে বাবাজি যাই কিছু দেই এই অধমকে আপনার মেহের বাণী ও খোদার ফজল থেকে মোটেই বঞ্চিত করবেন না। এই বলে বলছি যে নগদ না দিয়ে সরাসরি অংশ নিয়ে নেই বলে বাড়ীর এক ছেলেকে ডাক দিয়ে বললাম সাহাবদ্দিন আমার ঘরের সামনে ইটগুলি থেকে ২/৩ টি ইট নিয়ে এসো, ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সাহাবদ্দিন ৩টি ইট নিয়ে হাজির, আমি বলছি, সাহেব এই ৩ টি ইট মসজিদের কাজে লাগিয়ে আমার আশা পূর্ণ করুন। আপনার বড় মেহেরবানী। ইট দেখে ভদ্রলোক বিস্মিত চিত্তে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ইট রেখে না যাইতে পারে, যেহেতু সে বড়ই নেক কামাতে এসেছে এবং এই ৩ ইটের বোঝা নিয়ে যাওয়াও তার জন্য দুঃসাধ্য। একটু দুরে আমার পিতা বসা ছিলেন তিনি আমার যাবতীয় কথা শুনছিলেন, লোকটি যখন ইটের ঝামেলায় পড়েছে দেখছেন তখন দুর থেকে আমার পিতা এসে আমাকে কিছু তিরস্কার সুচক কথা বলে, লোকটিকে যাওয়ার জন্য বল্লেন, আমাকে বলেছেন তুমি টাকা না দিয়ে ইট দিয়েছ এটা ভাল করেছ তবে ইনি ইটগুলি নিবে কেমন করে? তোমার ইট রেখে দাও আর লোকটিকে বললেন, মিয়া সাহেব আপনি চলে যান। আমি আমার আব্বাকে বলছি আব্বাজান! এই লোক আজ থেকে ১০ বছর আগেও এই মসজিদের ছাদের জন্য চাদা তুলতো, আজও তুলছে এটা তার পেশা, সে নেকীর জন্য নয়।

মুসল্লী পাকা না করে মসজিদের নামে টাকা কামানোর উপায় বের করা কি উল্টো জগতের লক্ষণ নয়?! (চলমান)

হাফেজ মোহাম্মদ সেকান্দর আলী

[লেখক বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকৎসাধীন রয়েছেন, সকলের কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে –সম্পাদক]

বিবাহ- শাদী সম্পর্কিত কিছু কথা

আহমদীয়াত কোন নতুন ধর্মের নাম নয় বরং এটি একটি খাঁটি ইসলামেরই নবজাগরণ। আহমদীয়া মুসলিম জামাত মূলতঃ একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নাম, একটি রুহানী সংগঠন বিশেষ। প্রত্যেক সংগঠনেরই নিজেস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু নিজস্ব নিয়ম রীতি থাকে। আহমদীয়া জামাতেরও আছে। আজকে এরই একটি দিক আহমদীয়া জামাতের সামনে স্মরণ করিয়ে দেয়া আবশ্যক মনে করছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বিগত ১৯৮৯ সনে জামাআতের শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালন করে শেষ যুগে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের বিষয়টা সারা বিশ্বের মানুষকে জানিয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর ইন্তেকালের পর 'খিলাফত আলা মিনহাযে নবুওয়াতত' এর ধারায় আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত খেলাফত একশত বছর পূর্ণ করে কৃতজ্ঞতার সাথে তারও জুবিলী উৎসব পালন করেছে গত ২৭শে মে, ২০০৮ তারিখে।

আহমদীয়া মুসলিম জামতের সব কর্মসূচী সারা বিশ্বে কুরআনের শিক্ষা ও নবীনেতা খাতামান্নাবীঈন হযরত মোহাম্মদ আরাবী (সা.) এর আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার। উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার ইমাম মাহদীর (আ.) কাজ হলো নূতন আকাশ নূতন পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা, জগদ্বাসীকে একই উম্মতের অধীনে এনে শান্তির ছায়াতলে আনা, ক্ষুধা পীড়িত বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য স্বেচ্ছাপ্রনোদিত এক বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা।

সবাই শুধু মুখেই বলে, ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। কিন্তু হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত জামাত ছাড়া সমাজের ধর্মবেত্তাগণ সাধারণ মানুষকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় ও জরুরী বিষয়গুলো শেখান না। এ বিষয়গুলো সমাজ জীবনে শেখানোর শিক্ষকও আজ জামাতে আহমদীয়া। ইসলামী ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের জীবন কেমন হবে? "ইন্নাল জান্নাতা তাহতা আকদামেল উম্মাহাত"- অর্থাৎ মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত-হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ বাণীর মমার্থ কি হবে তা ক'জন জানে?

বর্তমান সময়ে মানুষ এতটা অধঃপতিত যে, চলমান সমাজে পিতা-মাতা সন্তানের পার্থিব শিক্ষায় যতটা মনোযোগী, ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখানোর বেলায় তার চেয়েও অধিক উদাসীন, অমনোযোগী। অথচ পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম প্রত্যেক গৃহস্বামীকে সাবধান করে এরশাদ করেছেন "ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা" অর্থ্যাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে (দোযখের) আগুন থেকে রক্ষা কর (সূরা তাহরীম- আয়াত-০৭)।

আহমদীয়া জামাতে বর্তমান সময়ে হঠাৎ করে অ-আহমদীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ঢেউ উঠেছে। যা' মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ অবস্থার জন্য সহশিক্ষা, বেপর্দেগী ও মাতা-পিতার উদাসীনতা এবং সর্বশেষ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোন ব্যবহার দায়ী। ছেলে- মেয়ে যখন কৈশোরে পৌঁছে তখন তাদের দেহে ও মনে পরিবর্তন আসে। এ সময়টুকুতে পিতা-মাতাদের রাখালের মত তাদের সন্তানদের নিগরানীর প্রয়োজন। হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) এজন্য এরশাদ করেছেন "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

আমাদের কিছু কিছু ছেলে-মেয়েরা উদারতার দোহাই দিয়ে শয়তানের পদাংঙ্ক অনুসরণ করছে এবং জামাতের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে। এরূপ সম্পর্ক কুরআন মজীদে প্রদত্ত আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী। যারা আজও (শতবর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পর) এ উম্মতে মোহাম্মাদীয়াতে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে মানেনি, তার প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ছায়াতলে স্থান গ্রহণ করেনি- তাদেরকে ঈমানদার মনে করে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিজ উদ্যোগে দোযখে প্রবেশ করার শামিল।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- "বিয়েতে পাত্রীর চারটি বিষয় দেখা হয়ে থাকে (১) তার ধন-সম্পদ (২) তার সৎ গুণ (৩) তার সৌন্দর্য্য এবং (৪) তার ধর্মপরায়ণতা। কিন্তু, যে নারী ধর্মপরায়ণ, পূন্যবতী তাকে বিয়ে কর (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যারা আমাদেরকে কাফের বলে আমাদের নাম দাজ্জাল রাখে অথবা তারা নিজেরা না বললেও তাদের (যারা আমাদের কাফের ও দাজ্জাল বলে) প্রশংসা করে অথবা তাদের অধীন, সে সব লোকদের সাথে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন নেই।" (ফতওয়ায়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- পৃঃ ১৪৪)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯২০ সনের ২৭ শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, "এ যমানায় আমাদের জামাতের এটা জানা একান্ত কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি গয়ের আহমদীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করে, সে নিশ্চিতই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে বুঝে নাই এবং জানে না যে আহমদীয়াত কি জিনিস।"

সাম্প্রতিক কালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কিছু নীতি নির্ধারণী পত্রে হযরত আমীরুল মোমেনীন সাইয়েদেনা মীর্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এরশাদ করেছেন যে যারা মুকায্যেব মুকাফ্ফের (যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মিথ্যাবাদী ও কাফের বলে বা মনে করে) কর্তৃক তাদের বিয়ে পড়িয়েছে, তারা প্রকৃত পক্ষে মুরতাদ হয়ে গেছে। এসব লোকদেরকে আবার বাইয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দাখেল হতে হবে। যারা অ-আহমদী পরিবারে বিয়ে করে জামাতের শৃংখলা বিনষ্ট করেছে তারা এখরাজে নেযামে জামাতের শাস্তিযোগ্য।"

যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ মেনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর হাতে বয়েত করেছে- তারা এবং যারা তাকে মানেনি, তারা সমান হতে পারে না।

আল্লাহ্ কুরআন মজীদে বলেন, "তার আয়াতসমূহের মাঝে এটা অন্যতম যে, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের মধ্যে তোমরা মনের শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে" (সূরা রুম-আয়াত ২২)। তিনি (আল্লাহ্) আরো বলেন- "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের জন্য পরিচ্ছদস্বরূপ এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের জন্য পরিচ্ছদস্বরূপ (সূরা বাকারা-আয়াত-১৮৮)। আল্লাহর এ বাণীগুলোকে নিজেরা আত্মস্থ করলে আমাদেরকে অবশ্যই সবদিক চিন্তা করে আমাদের পারিবারিক জীবনের ভিত্ গড়তে হবে। আমাদের নিজেদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আমাদের শান্তিময় বৈবাহিক সম্পর্ক করা অত্যাবশ্যকীয়। একই সাথে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কথাও প্রত্যেককে ভাবতে হবে। আমরা নিশ্চিত যে, দু'টি পৃথক চিন্তা-বিশ্বাস বরং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত মুখী চিন্তা চেতনা পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইবার অবস্থাটা অনুকূল করে না। এরূপ সম্পর্ক চিরদিনই আত্মিক উন্নতির অন্তরায়। আমাদের সমাজে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আমরা শেষ যুগের সংস্কারক ইমাম আযম হযরত মাহদী (আ.) কে মেনেছি-সব বেদা'ত থেকে বাঁচার জন্য। এ মানা প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ঈমান এনে তার নির্দেশনা মানার জন্য। ভবিষ্যতে একজনের না মানা- অন্যজনের (স্বামী বা স্ত্রী) মানার ব্যাপারটা কি একটা পারিবারিক জীবনে অন্তরায় হয়ে উঠবে না? আহমদীরা ধর্মকে পার্থিব সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় কোন দুনিয়াদার স্বামী বা স্ত্রী আহমদীদের সাথে সংসার করলে দাম্পত্য সমস্যা ও পারিবারিক অস্বস্তি দেখা দেয়া একটা স্বাভাবিক বিষয়।

এ বিষয়গুলো আগে-ভাগেই ভাবতে হবে। ইসলামে বিয়ের জন্য ওলী আবশ্যক-ওলী বা পিতা-মাতার সম্মতিছাড়া বিয়ে ইসলামে নেই। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক তার ওলীর/অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করে, তার বিয়ে অবৈধ (তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন) (আবু দাউদ, তিরমিযী)। ব্যভিচার বৈধ নয়, গোপন বন্ধুত্বও বৈধ নয় (সূরা মায়েদা-আয়াত ৬)। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে সূরা নিসার ২৩ নং আয়াত থেকে ২৫ নং আয়াতে যাদের সাথে বিয়ে জায়েয নয়- তা' বলে দিয়েছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বিয়ের আলোচনা পূর্ণ করার পর হযরত রাসূলুল্লাহ'র (সা.) শিক্ষা মোতাবেক পাত্র-পাত্রীর মাঝে একবার দেখা করার অনুমতি রয়েছে। স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা আবশ্যক (সূরা নিসা-আয়াত ৫)। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিয়ের যে শর্তটি সর্বপ্রথম পূরণীয়, তা হলো মোহরানা ধার্য করা; যদ্বারা তার গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করা হয়েছে (বোখারী, মুসলিম)। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বরের মাসিক আয়ের কমপক্ষে ছ'মাসের আয় মোহরানা দেয়ার প্রচলন রয়েছে। দু'জনের দৈহিক সান্নিধ্যে আসার আগে স্বামী তার স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ

করতে পারে আবার সময় নির্ধারণ করে ধীরে ধীরেও পরিশোধ করতে পারে। প্রত্যেক বিয়ের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে হবু স্বামী, স্ত্রীর সম্মতি, ওলীর স্বাক্ষর ও মোহরানার অংক উল্লেখ করা জরুরী। তেমনিভাবে, দেশের প্রচলিত আইনে প্রত্যেকটি বিয়ে রেজেস্ট্রি করতে হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণের বিয়ের এলান জামাতের মসজিদগুলোতে অথবা সমাজের সামনে প্রকাশ্যে হয়ে থাকে। জামাতের মুরব্বী, মোয়াল্লেম, আমীর, প্রেসিডেন্ট সাহেবানেরা বিয়ের নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করে বিয়ের এলান করেন-

'আলহামদুলিল্লাহে নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়ীনু ওয়া নাস্তাগফেরহু ওয়ানুমেনু বেহী .... ওয়া নাশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। ইয়া আইয়ুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী .... ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বেমা তা'মালুন।"

এরপর প্রথমে কন্যার ওলী (অভিভাবক)-এর কাছে বরের নাম ধাম ও মোহরানার অংক ঘোষণার মাধ্যমে বিয়ের সম্মতি গ্রহণ করেন এবং পরে একইভাবে বরের সম্মতি নেন। তারপর সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে বিয়ের এলান পর্ব শেষ হয়।

বিয়ের পরবর্তী সুন্নত দাওয়াতে ওলীমা। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর পায়ে হলুদের রং দেখে প্রিয় নবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? তিনি উত্তরে বললেন আমি পাঁচ দিরহাম ওজনের স্বর্ণের বিনিময়ে এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছি। হযরত নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। একটি ছাগল জবেহ করে হলেও ওলীমা কর।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাগণ একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিয়ের পর কন্যা বিদায়ে কন্যার পিতার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করার উপর নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে কন্যার পিতার সাধ্য মোতাবেক কন্যা বিদায়ে রুখসতানার সময়ে মেহমান নেওয়াজীর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৩০তম জাতীয় মজলিসে শূরায় বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বিষয়টির নিগরানীর জন্য জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়তের নেতৃত্বে অঙ্গসংগঠন সমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে দিয়েছেন এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইতোমধ্যে এ কমিটিকে অবিলম্বে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, আমাদের সবার উচিত হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আধ্যাত্মিক দ্বীপটির প্রান্তসমূহ সুরক্ষা করা। তা না হলে আমরাও যদি অন্যদের মত সামাজিক কদাচার ও পাপের বন্যায় নিজেদেরকে ও পরবর্তী প্রজন্মকে ভাসিয়ে দেই, পরিণামে আমরাই ক্ষতিগ্রস্থ হব।

আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম

(৪৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসা এবং মানব জাতির প্রতি সহমর্মিতা। এগুলো হল প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং সুতরাং যারা এই দাবী করে যে ইসলাম একটি উগ্র এবং বর্বর ধর্ম তাদের দাবী সম্পূর্ণ ভুল।

তিনি (আই.) আরো বলেন যে মহানবী (সা.) এর সময় সর্বশেষ উপায় হিসেবে এবং শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো। ইসলামের ইতিহাসে এটা কোথাও পাওয়া যায় না যে, মহানবী (সা.) নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে কোন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তিনি (সা.) প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য্য, সম্মান ও বিশ্বাসে স্বাধীনতা প্রদানের শিক্ষা দিয়েছেন। এই নীতি গত কয়েক বছরের সন্ত্রাসী হামলা এবং আত্মঘাতী বোমা হামলার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। শান্তি এবং মানবজাতির সেবা করার প্রকৃত শিক্ষা সকলের সামনে তুলে ধরাই আহমদীয়া জামাআতের লক্ষ্য।

এই শিক্ষার আলোকে গরীবের উন্নয়ন, বঞ্চিতদের সাহায্য করা এবং অশিক্ষিতদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আহমদীয়া জামাআত দায়বদ্ধ। তিনি বলেন এই জামাআত প্রতিনিয়ত মানবজাতির সেবা এবং বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত। তিনি বলেন অতি সাম্প্রতিক কালে তাঁর আফ্রিকা সফরে, বেনিনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা তাকে জানান যে সম্প্রতি তারা সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সংস্থার নিকট আবেদন জানিয়েছিল কিন্তু শুধুমাত্র এই আহমদীয়া জামাআতই রোগ-ব্যাধি এবং দারিদ্রতা মোকাবেলা করার জন্য তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের পাঠানো শুভেচ্ছা বাণী পাঠের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে যেখানে তিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এবং সমাজিকভাবে এতে অংশগ্রহণের জন্য আহমদীয়া জামাআতকে অভিনন্দন জানান।

মাহমুদ আহমদ (বিপ্লব)
নিউজ ডেস্ক, পাক্ষিক আহমদী

In the Name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful
International Press and Media Desk
AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
22 Deer Park, London, SW19 3TL
Tel / Fax (44) 020 8544 7613 Mobile (44) 07795460318
Email: press@ahmadiyya.org.uk
Web: Alislam.org
11 June 2008

The Ahmadiyya Muslim Community yesterday continued its celebrations of 100 years of Khilafat, the system of spiritual leadership that unites the tens of millions of Ahmadi Muslims throughout the world. The keynote address was delivered by the Khalifa himself, His Holiness, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad the World Head of the Community.The event was also attended by a number of senior members of Government, Parliament and various other organisations.

The President of the Ahmadiyya Muslim Community UK, Mr Rafiq Hayat used his opening remarks to inform the audience of the importance of Khilafat. He said it was the task of the Khalifa to continue the work of a prophet, bringing the whole of mankind closer to God and thus establishing true peace on earth.

Following the opening address dignitaries including, Lord Eric Avebury, Jonathon Shaw MP and Baroness Sayeeda Warsi took to the stage to congratulate the Ahmadiyya Community for its social contribution throughout the world. Baroness Warsi urged society to 'stand up and be counted' in responding to the continued persecution of the Ahmadiyya Community in countries such as Pakistan, Bangladesh and most recently Indonesia.

The Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Jack Straw MP spoke of his admiration for the Ahmadiyya Community. He said:

"I am delighted to be able to bring with me the best wishes of Her Majesty's Government and the Prime Minister Gordon Brown. All of us hugely admire the work of the Ahmadiyya Community both in the UK and worldwide... I am very happy to be here to mark the great work you do in promoting peace and brotherhood throughout the world."

A long standing supporter of the Ahmadiyya Community, Baroness Emma Nicholson MEP spoke of her continued efforts to end the persecution of Ahmadi Muslims. She said that she had personally spoken to the President of Pakistan in relation to this issue and that it was the duty of all free people to fight for the rights of those minorities who were the victims of prejudice and hatred.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad took to the stage at 7.30pm and used his keynote address to rebut the allegation that Islam was spread by the sword. He spoke of how Jihad continued to be misunderstood because of the acts of extremist and so called Muslims who abused the teachings of Islam.
His Holiness begun by introducing the Ahmadiyya Muslim Community by stating it comprised people who believed that the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) was the final law bearing prophet. He had prophesised that a Messiah and Reformer would come to salvage and rejuvenate the religion of Islam at a time when it had been greatly corrupted. His Holiness said that members of the Community believed that this person had come in the person of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad who founded the Community in India in 1889.

His Holiness spoke about one of the greatest signs in favour of the truth of the Promised Messiah. The Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) had prophesised 1400 years previously that at the time of the Messiah and Reformer there would be an eclipse of the moon on 13th night of the Islamic month of Ramadan, whilst during the same month there would be a solar eclipse on 28th day of the very same month. In both 1894 and 1895 this prophecy was fulfilled in support of the claim of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.

His Holiness said that the Ahmadiyya Community was founded on two principles which continued to be the basis of its teachings. They were love for God Almighty and love for mankind. These were the true Islamic teachings and thus those who claimed that Islam was a violent and barbaric religion were wholly mistaken.

His Holiness stated that in the time of the Holy Prophet, permission was granted to fight only as a last resort and only as a means of defence. Never in the history of Islam had the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) initiated a single battle. He in fact taught tolerance, respect and freedom of belief. This principle was being lost in light of the terrorist attacks and suicide bombings that had occurred over the last few years. The Ahmadiyya Community's purpose was to bring to the fore these true teachings of peace and service to mankind.

In light of these teachings the Ahmadiyya Community was committed to developing the under?developed, to helping the deprived and to educate the uneducated. He said that the Community was constantly engaged in humanitarian services and disaster relief. He said that on a recent tour of Africa a leading chief in Benin had told him that recently he had appealed for humanitarian aid to many agencies but it was only the Ahmadiyya Community who had stepped forward to fight disease and poverty in that region. The event concluded following a message of goodwill sent by Prime Minister Gordon Brown in which he congratulated the Ahmadiyya Community on its continued effort to bring peace to the world and for its social contribution.

End of Release

Abid Khan Press Secretary, Ahmadiyya Muslim Community (07795460318)

জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য মুসলমানদের বুঝা উচিত

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যোগদান

গতকাল (১০.০৬.০৮) 'আহমদীয়া মুসলিম জামাআত' এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান অব্যাহত ছিল। খিলাফত হচ্ছে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনা, যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ আহমদীদেরকে একতাবদ্ধ করে রেখেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এ অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য পেশ করেন। এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য সরকার এর জাতীয় সংসদের এবং বিভিন্ন সংগঠনের বেশ কিছু সংখ্যক সিনিয়র সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক হায়াত উদ্বোধনী ভাষণে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর উদ্দেশ্যে খিলাফতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন খলীফার কাজ হলো নবীর কাজকে অব্যাহত রাখা, সমস্ত মানবজাতীকে খোদা তাআলা মুখী করা এবং এভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্বোধনী ভাষণের পর উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে লর্ড এরিক অ্যাভেবুরি, জনাথন স' MP এবং ব্যারোনেস সাঈদা ওয়ারসি মঞ্চে আসেন এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাআতকে অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন দেশ যেমন- পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং অতি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া জামাআতের উপর চলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ব্যারোনেস সাঈদা ওয়ারসি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহবান জানান।

লর্ড চ্যান্সেলর এবং বিচার মন্ত্রী জ্যাক স্ট্র MP তার বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাআতের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আপনাদের জন্য 'মহামান্য রাণী-র সরকার এবং প্রধান মন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন উভয়ের শুভেচ্ছা বয়ে আনতে পেরে আমি আনন্দিত। আমরা সকলেই যুক্তরাজ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাআতের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে থাকি। ....এখানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মহান কাজ প্রত্যক্ষ করতে পেরে আমি অভিভূত।'

আহমদীয়া জামাআতের দীর্ঘ দিনের সমর্থক ব্যারোনেস ইমা নিকলসন MEP তার বক্তৃতায় আহমদী মুসলমানদের উপর অত্যাচারের অবসান ঘটাতে তার অব্যাহত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছেন এবং এটা প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্য যে, তারা সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য লড়াই করবে যারা অত্যাচারিত এবং ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) সন্ধ্যা ৭.৩০মিনিটে মঞ্চে আসেন এবং তিনি তাঁর মূল বক্তব্যে **তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল এ অভিযোগটি খন্ডন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, উগ্রপন্থীদের কর্মকান্ড এবং তথাকথিত মুসলমান যারা ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদের কারনে মানুষ জিহাদকে এতটা ভুল বুঝেছে।**

তিনি (আই.) শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এ জামাআতের সদস্যরা পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশেষ শরিয়তবাহী নবী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যখন ইসলাম ধর্ম ভীষনভাবে কলুষিত হবে তখন একজন মসীহ এবং সংস্কারক আসবেন যিনি ইসলাম ধর্মকে উদ্ধার এবং পুনরায় সঞ্জীবিত করবেন। তিনি (আই.) বলেন, এই জামাআতের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে, সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি এসে গেছেন এবং তিনিই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যিনি ১৮৮৯ সালে ভারতে এই জামাআত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর সত্যতার জন্য তিনি (আই.) একটি মহান নিদর্শনের উল্লেখ করেন। ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মসীহ এবং মাহদী (আ.) এর সময় রমযান মাসের ১৩তম রাতে চন্দ্র গ্রহন হবে এবং একই সাথে ঐ একই মাসের ২৮তম দিনে সূর্য গ্রহন সংঘটিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ উভয় সালেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সমর্থনে পূর্ণ হয়েছে।

তিনি (আই.) বলেন, এই জামাআত দু'টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা এর আদর্শগত মূলভিত্তি হিসেবে অব্যাহত রয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়)

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী মহাসমারোহে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে উদযাপিত

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন মোহতারাম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

গত ২৭শে মে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশও আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান রূহানী ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করে। আজ থেকে শত বছর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর তিরোধানের পর ২৭ মে, ১৯০৮ সালে হযরত হাফেয হেকীম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া খিলাফতের তথা ইসলামে খিলাফতে রাশেদার নব যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে আহমদীয়া খিলাফতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর আশিসময় যুগ চলছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের পুনরুজ্জীবন, প্রচার, প্রসার এবং মুসলিম উম্মাহ ও মানব জাতির সংশোধন কল্পে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী রূপে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ১৮৮৯ সালে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ১৯০ টিরও বেশী দেশে এই জামাআত সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও যুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রধান কর্মসূচী। এ ছাড়াও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, জন কল্যাণ ও মানব সেবামূলক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আহমদীয়া শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশের প্রত্যেকটি স্থানীয় জামাআতে আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালার এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, বিশেষ দোয়া, গরু-ছাগল সদকা, দরিদ্রদের মাঝে মাংস বিতরণ, পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের মাঝে মিষ্টি ও উপহার সামগ্রী বিতরণ, জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম, আলোচনা অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী ইত্যাদি।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী

উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকায় ২৭শে মে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০-৩০ মিঃ মোহতারাম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর ও চেয়ারম্যান খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন জাতীয় কমিটি এর সভাপতিত্বে আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন জামেয়া আহমদীয়া-র শিক্ষার্থী ওয়াকফে নও জনাব মামুনুর রশিদ। হযরত আমিরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণী পাঠ করে শুনান মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে **"বিশ্বব্যাপী খিলাফতের কল্যাণ"** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। **"খিলাফতের শতবর্ষ"** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব জাফর আহমদ, লেফটেনেন্ট কমান্ডার (অবঃ)। এই বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

খিলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকেল ৩টায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। এতে কুরআন তিলাওয়াত করেন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষার্থী জনাব মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন, দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন আতফাল ও নাসেরাতগণ। **"খিলাফতের দর্শন ও আহমদীয়া খিলাফত"** বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এরপর আহমদীয়া এবং আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার, মূল্যবান ক্রেষ্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন, জাসদের নির্বাহী সভাপতি জনাব মঈন উদ্দিন খাঁন বাদল, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী লেখক ও সাংবাদিক জনাব শাহরিয়ার কবীর, জনাব ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, জনাব ফাদার টিম, সিষ্টার রোজলিন ডি কষ্টা, জনাব নাঈম মোহাইমেন, জনাব রেহান সোবাহান, মিসেস তানিয়া রহমান, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী এবং ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী প্রমুখ। এরপর মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সন্ধ্যা ৬টায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উপলক্ষে যুগান্তকারী ভাষণ স্যাটেলাইট টেলিভিশন এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক যোগে প্রচার করা হয়। এই মহামূল্যবান ভাষণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিটি আহমদী গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে সুশোভিত সামিয়ানার নীচে সারিবদ্ধভাবে চেয়ারে বসে সুশৃঙ্খলভাবে নীরবতা বজায় রেখে শ্রবণ করেন। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত আহমদী সহস্রাধিক শ্রোতাসহ সমগ্র বাংলাদেশের আহমদী হুযূর (আই.) আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উপলক্ষে MTA এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেন, তাতে বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সরাসরি সম্মিলিত ভাবে অংশ নিয়ে নবরূপে উজ্জীবিত হোন।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ জলসার খবর বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

মাহমুদ আহমদ সুমন
নিউজ ডেস্ক
পাক্ষিক আহমদী

মহাসমারোহে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সারা বাংলাদেশের প্রায় একশত স্থানীয় জামাআতে আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালিত

[বহু সংখ্যক স্থানীয় জামাআত থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। ধারাবাহিক ভাবে তা সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হচ্ছে। প্রথম কিস্তি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।]

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দিক নির্দেশনা মোতাবেক আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক কর্মসূচী দোয়ার সাথে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আনন্দঘন পরিবেশে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়।

ছয়টি হালকায় ছয়টি নামাযের স্থানে প্রায় ৪০০ জন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। ঘরে ঘরে বাজামাত ও এককভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করেন প্রায় ৬০০ জন।

ফজরের নামাযের পর ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়। মসজিদুল মাহদীতে অবস্থিত মরহুম সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রা.)-এর কবর জিয়ারত ও দোয়ার মাধ্যমে জামাআতের আরো তিনটি কবরস্থানে মুসীয়ানদের কবর জিয়ারত ও দোয়া করা হয়। আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে জামাআতের পক্ষ থেকে সদকা প্রদান করা হয় ৪টি ছাগল। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছিল-র‍্যালি, মিষ্টি বিতরণ, অ-আহমদীদের মাঝে তোহ্‌ফা বিতরণ ইত্যাদি।

সকাল ১০ ঃ ৩০ টায় আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় হুযূর (আই.)-এর আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উপলক্ষে মহামূল্যবান ভাষণ এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসারি সবাই গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন।

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জলসায় বক্তব্য রাখছেন বি,বাড়ীয়ার জামাআতের আমীর।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ময়মনসিংহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ময়মনসিংহ খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব (১৯০৮-২০০৮) উপলক্ষে কেন্দ্রের কর্মসূচী মোতাবেক সকল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে আল হামদুলিল্লাহ্। ময়মনসিংহ জামাআতে পালনকৃত কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো

২৫/০৫/০৮ ইং বিকাল ৪টায় ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালিত হয়। এতে আনসার খোদ্দাম ও আতফাল সহ সর্বমোট ৩১ জন অংশ গ্রহণ করেন। ২/১ জন নন-আহমদী ছেলেও এতে অংশ নেয়।

২৬/০৫/০৮ইং দিবাগত রাত্রি ৩.৪৫ মিনিটে বাজামাআত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। এতে সর্বমোট ৬০ জন অংশ গ্রহণ করেন। লাজনা, নাসেরাত, খোদ্দাম, আনসার ও আতফালগণ উপস্থিত ছিলেন

২৭/০৫/০৮ইং বাদ ফজর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে মহান আল্লাহ্ তাআলার

দরবারে শুকরিয়া আদায় করে ইজতেমায়ী দোয়া হয়।

২৭/০৫/০৮ইং সকাল ৬ ঘটিকায় উপস্থিত সকল আহমদীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং এলাকাতে ব্যাপক মিষ্টি ও তোহফা বিতরণ করা হয়েছে।

২৭/০৫/০৮ইং সকাল ৭টায় ১টি ছাগল সদকা দেওয়া হয় এবং তা স্থানীয় গরীব ৩২ জন আহমদী পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

২৭/০৫/০৮ইং সকাল ১০ ঃ ৩০ মিঃ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং একটানা বেলা ১টা পর্যন্ত চলে। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট মৌলবী মোহাম্মদ আমীর হোসেন। হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করে শুনান সভাপতি।

তারপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় এমটিএ-এর মাধ্যমে প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর ভাষণ সবাই মিলে শ্রবণ করে।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বীরগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বীরগাঁও বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ জুবিলী জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। বাদ ফযর একটি খাসি সদকা করা হয়। সকাল ১০.৩০ মিনিট জুবিলী উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে উপস্থিত ছিল ২৫ জন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

কামাল উদ্দিন

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে তেজগাঁ জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব সফিউল আলম সাহেবের সভাপতিত্বে আয়োজিত জলসায় বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেব।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তেজগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তেজগাঁও-এ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮ পালন করা হয়, বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে শুরু হয়। ফযরের নামযের পর দুটি খাসি সদকা দেওয়া হয় ও মিষ্টি বিরতণ করা হয়।

সকাল ১০-৩০ মিনিটে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী আলোচনা সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মোহতারাম প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তেজগাঁও। আলোচনা সভায় বক্তাগণ খিলাফত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের কুরআন শরীফ, হাদীস এবং বিভিন্ন ভাষায় বই এবং পত্রিকা প্রদর্শন করা হয়। লাজনা, আনসার, খোদ্দাম এবং আতফাল সর্বমোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মাঝে কিছু জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। জেরে তবলীগগণকে কিছু বই দেওয়া হয়। হুযূর (ই.)-এর আহমদীয়া খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে মূল্যবান ভাষণ MTA-এর মাধ্যমে গভীর আগ্রহে শ্রবণ করেন।

প্রেসিডেন্ট, তেজগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ক্রোড়া

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী কর্মসূচী বস্তবায়নের জন্য হুযূর (আই.)-এর তাহরিক মোতাবেক ক্রোড়া জামাআতে গত ২৫/০৫/০৮ ইং রোযা রাখি, ঐদিন সকাল ১০টায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন সাহেবের নেতৃত্বে, আখাউড়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়াকারে আমল করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন তিন জন জাতিয় পত্রিকার সাংবাদিক, ২জন

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করছেন ক্রোড়া জামাআতের প্রেসিডেন্ট সাহেব।

ক্রোড়ায় জুবিলী জলসায় অংশগ্রহণকারী শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

পৌরসভার কমিশনার, আর এস ও ডা. আব্দুল মমিন সাহেব, ডাঃ শাহ্ আলম সাহেব সহ স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছাশ্রমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন সাহেব। উপস্থিত প্রায় দুই শত গয়ের আহমদী আমাদের কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। এতে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ২৭মে ৩-৩০ মিনিটে মসজিদে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। আবহাওয়া প্রতিকূলাতা থাকা সত্ত্বেও, আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। তিনটি হালকাতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। মসজিদ ও হালকাগুলোতে বাজামাত ফযরের নামায আদায়ের পর সকাল ৫ টায় ইজতেমায়ী দোয়া করানো হয়। সকাল ৫-২০ মিঃ স্থানীয় আহমদীয়া কবরস্থান জিয়ারত করা হয়। ৬-৩০ মিঃ একটি খাসি সদকা দেওয়া হয়।

সকাল ১০টায় আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮ উপর নির্দ্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর এক মহতী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট সাহেব। তারপর নিমন্ত্রণকৃত পাঁচজন জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় জামাআতের প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন সাহেব আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অবহিত করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সাংবাদিকদের মাঝে খিলাফত জুবিলী মনোগ্রাম সম্বলিত পেপার ওয়েট ও চাবির রিং উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্য থেকে হাজী রফিকুল ইসলাম সাহেব (দৈনিক খবর) শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আই.) টিভির পর্দায় এলে উপস্থিত সদস্য সদস্যাদের মাঝে এক অনাবিল আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। রাত ৮-১৫ মিনিট পর্যন্ত সবাই মনোযোগ সহকারে হুযূর (আই.)-এর ভাষণ শ্রবণ করি, এতে সবাই মিলে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক ইন্টু

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরা

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মসলিম জামাআত ঘাটুরা খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ২৭ মে ০৮ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা ও নেক কাজের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদযাপন করতে সামর্থ হয়েছে (আল হামদুলিল্লাহ্)। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায এর মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। সকলকে সেমাই দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। ফযরের নামাযের পর ইজতেমায়ী দোয়া হয় এবং দোয়ার পর জামাআতের ১০০% সদস্য সদস্যাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। মসজিদ সংশ্লিষ্ট অ-আহমদী বাড়ীতে প্রায় ১৫০ জন সদস্য/সদস্যার মাঝেও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অতঃপর ২টি খাসী সদকা করা হয়। সকাল ১১টা থেকে জলসার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ মুসা মিয়া। তেলাওয়াতে

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন ঘাটুরা জামাআতের সদস্যগণ।

ঘাটুরায় আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানের শ্রোতাবৃন্দের একাংশ।

কুরআন ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে এস এম আরমান এবং এস এম, সেলিম। অতঃপর সভাপতি সাহেব হুযূর (আই.)-এর বাণী পাঠ করেন এবং উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন। জলসায় খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। আসরের পর হুযূর (আই.) এর উপস্থিতিতে MTA-তে প্রচারিত জুবিলী জলসা সরাসরি শুনার ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদে জলসা দেখার ব্যবস্থা করা ছাড়াও ১২টি MTA সংযোগ একযোগে জুবিলী জলসায় প্রদত্ত হুযুর (আই.)-এর ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ভাষণ শুনার ব্যবস্থা করা হয়।

মোহাম্মদ মুসা মিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়ায় খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা ২৭ মে ২০০৮ রোজ মঙ্গলবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপ করা হয়। মাসব্যাপী খিলাফত জুবিলী জলসার কর্মসূচী সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হয়।

গত ২৬/৫/০৮ইং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে খিলাফত জুবিলীর উপহার পৌঁছানো হয়। উক্ত তারিখে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বিশেষ ওয়াকারে আমলও সম্পন্ন করা হয়। ২৬/৫/০৮ ইং দিবাগত রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে খিলাফত জুবিলী জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। বাদ ফজর দরসে কুরআন ও ব্যক্তি গত কুরআন তেলাওয়াত এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সকালে মুসিয়ানদের কবর জিয়ারত, সদকা ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। নিজেদের মধ্যে এবং অ আহমদীর মধ্যেও।

আহমদীয়া মসলিম জামাআত তারুয়ার প্রেসিডেন্ট ও খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা ২০০৮ এর চেয়ারম্যান জনাব জহির আহমদ মিয়াজি সাহেব-এর সভাপতিত্বে খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী জলসার কার্যক্রম শরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোয়জ্জেন হোসেন সানি, নজম পেশ করেন যথাক্রমে সোপন আহমদ ও ছাব্বির আহমদ। বক্তৃতা পর্বে প্রথমে হুযূর আকদাস (আই.)- এর খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে যে বাণী প্রদান করেন তা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব পাঠ করে শুনান। এরপর বিশ্বব্যাপী খিলাফতের পদমর্যাদা, নেযামে খিলাফত ও আমাদের দায়িত্বাবলী এই বিষয়গুলোর উপর বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে বেগম নুসরত জাহান প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, জনাব ফজলুর হক ভূইয়া, জনাব হারুনুর রশিদ ও জনাব মোজাফফর আহমদ রাজু মোয়াল্লেম, এরপর সভাপতি সাহেব-এর দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করে। উক্ত জলসায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত, আতফাল ও শিশুরাসহ আনন্দঘন পরিবেশে মোট ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আই.) এক্সেল সেন্টারে প্রদত্ত ভাষণ স্থানীয় মসজিদে বাশারত সহ বিভিন্ন হালকায় MTA সংযোগের মাধ্যমে শ্রবণ করেন।

জহির আহমদ মিয়াজি

আমরা শোকাহত

(১) আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রবীন সদস্য জনাব আব্দুল বারি (অলি মিঞা) সাহেব, গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ ইং বেলা ৩-৩০ মিঃ এর সময় বি-বাড়ীয়া থেকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য এ্যাম্বুলেন্সে আনার পথে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দীর্ঘদিনের ব্রঙ্কাইটিস সমস্যা ও Lunch enlargement জনিত কারণে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৬ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৬ মেয়ে ও ১৯ জন নাতি -নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যান। জনাব বারি সাহেব প্রথম জীবনে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিবাবে চাকুরী শুরু করেন। চাকুরী শেষে নিজ এলাকাতে কিছু দিন হাট ব্যবসা পরিচালনা করেন। তারপর পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে প্রায় ২০-২২ বৎসর সময় চট্টগ্রামে অবস্থিত "শাহ্ নেওয়াজ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড" বাংলাদেশ কোম্পানী নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরী করেন। সেই চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর কিছুদিন চট্টগ্রামে ও পরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে FORD & MERCEDEZ BENZ গাড়ীর Spare Sparts এর ব্যবসা পরিচালনা করেন। শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে পরবর্তিতে বাধ্য হয়ে ব্যবসা ছেড়ে অবসর গ্রহণ করেন । জনাব বারি সাহেব নিয়মিত নামায রোযা সহ যাবতীয় ইবাদতে সময় কাটাতেন। সর্বদা জামাআতের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকেছেন। যখন যেখানে জামাআতি অনুষ্ঠান, মিটিং, জলসা, ইজতেমা, সেমিনার, তবলীগি প্রোগ্রাম হয়েছে চেষ্টা করেছেন সেখানে উপস্থিত থাকতে। সাধ্য মত নিয়মিত আয় অনুযায়ী চাঁদা আদায় করেছেন।

১৬-১২-০৭ ইং রাতে বারি সাহেবের মরদেহ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্সে জানাযা শেষে বারডেম হাসপাতালের হিমাগারে (Mortuary) সংরক্ষণ করা হয়। পরের দিন ১৭-১২-০৭ইং মরহুমের বড় ছেলে জনাব আব্দুল হাদী স্বস্ত্রীক লন্ডন থেকে ঢাকায় আসার পর ঐ দিন রাতে আহমদী পাড়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) নিজ বাসস্থানে রাত ১১টায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাত প্রায় ১২টার সময় জামাআতের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে ২য় বার জানাযা শেষে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত জানাযায় বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন ও আহমদী অ-আহমদী বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত থেকে জানাযা ও দোয়ায় শরীক হন। পরিশেষে সকলের খেদমতে বিনীত দোয়ার আরজ যেন আল্লাহ্ পাক বারি সাহেবের অবর্তমানে তাঁর শূন্যতা পূরণ করে দেন ও তাকে জান্নাতের উচ্চস্থান নসীব করেন ও আত্মার মাগফিরাত দান করেন, আমীন।

বিনীত ঃ **মরহুমের স্ত্রী ও সকল সন্তানের পক্ষে মরহুমের কন্যা**

মরিয়ম সুলতানা (নীনা), ঢাকা।

(২) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার স্ত্রী নুসরাত জাহান (কাজল) গত ২-০৫-০৮ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১-৩০টায় চট্টগ্রামে তার বোনের বাসায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মরহুমা বি-বাড়ীয়া জামাআতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের ছোট ছেলের স্ত্রী। মৃত্যুর সময় তিনি ৪ বছরের ১ শিশু ছেলে রেখে যান। তিনি একজন ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। বি-বাড়ীয়া জুমুআর নামায শেষে তাকে দাফন করা হয়েছে। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য এবং জান্নাতে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন এবং মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন সে জন্য আন্তরিক ভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমার স্বামী ঃ **মাসুদ আহমদ**

কৃতী ছাত্রী

(১) আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বরিশাল এর নাসেরাত সদস্যা আমাতুন নূর মৌ এ বছর (২০০৮ সালে) বরিশাল বিভাগে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। সে বরিশাল জামাআতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফরিদ আহমদ এর ২য় মেয়ে। কৃতি ছাত্রী আমাতুন নূর মৌ জামাআতের সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

ডাঃ ফরিদ আহমদ

(২) মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে আমাদের বড় মেয়ে আতিয়াতুল হাই জুঁই, ২০০৮ ইং ফেব্রুয়ারী মাসে ফল প্রকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.S.S. in Sociology (Thesis group) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জন করেছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে সফলতা দান করেন সেজন্য জামাআতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

বাবুল আহমদ চৌধুরী
ও হামিদা বেগম
শান্তিনগর, ঢাকা

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্তত: আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিঁড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিঁড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

New Vol. No. 70 23rd & 24th Issue
Fortnightly

The AHMADI

30 June, 2008 Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

বায়তুল ইসলাম, ম্যাপ্‌ল-অন্টারিও, কানাডা। মসজিদ ও তদসংলগ্ন পার্ক যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com